নবীন

সপ্তদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০১৯

সূ চি প ত্র

হারানো হালখাতার খোঁজে ২
একটি সমাবর্তন ভাষণ ৫
কৃষক ও সরকারের মধ্যস্থতায় নির্ধারিত হোক
কৃষিপণ্যের দাম ৮
ব্লু ইকোনোমি: নতুন দিগন্তের হাতছানি ১০
অংকুর ১১
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে দ্বিগুণ হারে ১৪
ভাস্কো দা গামার দেশে আমাদের অর্জন ১৫
বিসিএস প্রস্তুতি : ৪০তম বিসিএস কাটমার্কস ও
যেভাবে নেবেন লিখিত প্রস্তুতি ১৬
অংকুর ১৮
রোজা থেকে নৈতিক শিক্ষা ২০
দুর্নীতি প্রতিরোধ : শুধু আইন নয়,
বদলাতে হবে মানসিকতা ২২
ফাউন্ডেশন ও প্রকল্প সংবাদ ২৩
ছাত্রজীবনে ভলান্টিয়ারিং কেন জরুরি? ২৪
প্রকল্প সংবাদ ২৭
মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা
বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে ৩০
মাথায় কত প্রশ্ন আসে ৩২

সম্পাদক : তাসনিম হাসান হাই   সহকারী সম্পাদক : মো. শাহরিয়ার পারভেজ

প্রকাশক : হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড, প্লট নং ২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক
শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : ৯১২১১৯০, ৯১২১১৯১, ০১৭২৭২০৯০৯৮। ই-মেইল : hdf.dhaka@gmail.com

ব্যবহার হালখাতার নাম লেখার গৌরববঞ্চিত করেছে বৈকি। নববর্ষের শুভেচ্ছাসমেত হালখাতার চিঠিপত্র বাড়িতে আসা শুরু হয়ে যেত চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে। চৌষট্টি সালে কলকাতার ওয়াসেক মোল্লার দোকান থেকে আসা নববর্ষের শুভেচ্ছাসহ হালখাতার আমন্ত্রণ সংবলিত চিঠি বাড়িতে দেখেছি। চট্টগ্রাম শহরের জুয়েলারি দোকানগুলোর প্রায় নেমন্তন্নপত্র চৈত্রেই এসে যেত। কোনো আমন্ত্রণপত্রে থাকত 'এলাহি ভরসা'। কোনোটায় 'নমোঃ গণেশায় নমোঃ', আবার কোনোটায় 'বুদ্ধনং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘম শরণং গচ্ছামি' কিংবা 'ক্রুশ' আঁকা। সব চিঠি জমিয়ে কিশোর তরুণরা ভাগ করে নিত কে কোন দোকানে যাবে। শ'খানেক আমন্ত্রণপত্র থেকে বাছাই করা হতো , দোকানের মান ও আপ্যায়নের পূর্ববর্তী গুণাগুণ থেকে। তবে পরিবারের পরিচিত বা ঘনিষ্ঠজনদের দোকানগুলো এড়ানোর কোনো সুযোগ ছিল না। বাড়তি লাভও ছিল। হালখাতায় নাম তোলার জন্য ১ পয়সা বা পাঁচ পয়সা জমা দিতে আর হতো না। উল্টো পাঁচ-দশ টাকা পকেটে গুঁজে দেয়া হতো। বুঝতাম নববর্ষের উপহার; মেলা থেকে কেনাকাটার সুযোগ করে দেয়া যেন। এ ভাবে রোজগারটা সে সময় কম হতো না। আর সালাম ঠুকলে তো উপহারের পরিমাণটা বেড়ে এক থেকে দুইশ টাকায় দাঁড়িয়ে যেত। সে এক আনন্দের দিন, রোমাঞ্চকর সুখের দিন, পরম ভালোলাগা, চরম উত্তেজনার দিন। সেসব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত, 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না' যারা। আবেগ উথলে উঠত বৈকি। এমনিতেই হরেক কিসিমের আকারের রসগোল্লা, সন্দেশ, মণ্ডা-মিঠাই, নিমকি, দই, ফিরনি, মোরগপোলাও সাঁটার প্রতিযোগিতাও চলছে। রাত একটা-দুইটা গড়িয়ে যেত। দৈবাৎ নববর্ষের প্রথম দিনে কালবৈশাখী ঝড় হানা দিত। তবে তা বিকালের দিকে কিংবা রাত ১০টার পর। সে কারণে হালখাতা শুরু হতো সকাল থেকেই।

চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে পয়লা বৈশাখ মানেই ভিন্নতর আবাহন। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিস্টান, হরিজন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের সহাবস্থান। তাই নববর্ষ এখানে আসে নানা বৈচিত্র্য নিয়ে। সবার বাড়িতে সবার আমন্ত্রণ—স্বতঃসিদ্ধ। খাবার আদান-প্রদানও চলে। পয়লা বৈশাখ মানেই হালখাতা। এমনটাই ছিল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়সহ শিক্ষিত সমাজে। বৈশাখী মেলার আবেদনও ছিল ভিন্নতর। চলত সপ্তাহব্যাপী। কিন্তু হালখাতা শুরু হতো পহেলা বৈশাখের সকাল থেকে। রাত গড়িয়ে যেত। হালখাতায় সপরিবারেও আসা হতো। মহিলাদের জন্য পৃথক আয়োজনও থাকত।

দোকানগুলো সাজানো হতো হরেক সাজে। কদিন ধরেই করা হতো সাফসুতরো। দোকানের সামনে কলাগাছ দিয়ে তোরণ। সুতোয় বাঁধা লাল নীল হলুদ সবুজ বেগুনি কাগজে সাজানো। দোকানের সামনে লেখা থাকত 'শুভ নববর্ষ, শুভ হালখাতা'। কলাগাছের তোরণের পাশে কলস-পানি, তুলসি পাতা, ঘটি ফুল, গাঁদা ফুল।

রঙিন বাতি দিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। দোকান ঘরের ভেতর গদিতে লালসালু, সাদা কাপড় দিয়ে তাক-তাকিয়া সাজিয়ে মহাজন-মালিক বেশ ধবধবে পোশাক পরে সুগন্ধী মাখিয়ে আসন পেতে বসতেন। দুপাশে দাঁড়ানো পাঙ্খাওয়ালা এবং হিসাবরক্ষক বসা। লাল কাপড়ের মোড়কে নতুন মোটা হালখাতা, পাশে সুতোয় বাঁধা কালির দোয়াত কলম। সকাল ৭টায় আগরবাতি, ধূপধুনো জ্বালিয়ে শুরু হতো হালখাতার উদ্বোধন। ছিটানো হতো গোলাপজল। মহাজন খাতায় কলমের আঁচর কেটে নতুন দিনটির শুভ সূচনা করতেন। ক্যাশ বাক্সের পাশে থাকত পঞ্জিকা। কোথাও দোয়া দরুদ, কোথাও মন্ত্র পাঠ দিয়ে শুরু হতো। হালখাতার আমন্ত্রণপত্র ক্রেতা, বন্ধু, প্রতিবেশী, বিদগ্ধজন, শুভার্থীদের আগেই পাঠানো হতো। বকেয়া হালনাগাদ করার জন্য সকালের দিকে ক্রেতারা টাকা নিয়ে আসতেন। বস্তাভর্তি করে টাকা নিয়ে আসার দৃশ্যও দেখেছি বক্সিরহাটে। বিকাল বা সন্ধ্যায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসতেন আমন্ত্রিতরা। পরনে সবার ধোপ দুরস্ত জামাকাপড়। আলিঙ্গন, করমর্দন (হ্যান্ডশেক), কুশলাদি জানা সবই চলত। সবার জন্যই অবারিত। দোকানের সামনে খোলা জায়গায় শামিয়ানা টানিয়ে অথবা দোকানের ভেতর সাজানো হতো পরিপাটি করে খাবারের ব্যবস্থা। নিমকি, রাবড়ি, দই, পানতোয়া, রসগোল্লা, সন্দেশ, কদমা, জিলিপি, রেশমি মিঠাই ইত্যাদি কোথাও একসঙ্গে মিলত। কোথাও তিনটির বেশি আইটেম থাকত না। বিভিন্ন দোকানিরা হাঁড়িভর্তি মিষ্টি পাঠাতেন তাদের ক্রেতাদের। অমন হাঁড়ি আসত কুমিল্লা থেকে। বাড়িতে দেখেছি। রসে ভেজা ওই মিষ্টির স্বাদ ভোলার নয়।

ষাটের দশকের পহেলা বৈশাখের সকাল অন্য দিনের মতো হতো না। স্কুল ছুটি থাকত বলে পড়াশোনার চাপ কম। তাই নববর্ষের জন্য প্রস্তুতিটা ভালোই নেয়া হতো। হালখাতা ছিল সার্বজনীন উৎসব। মূলত ব্যবসায়ীদের অনুষ্ঠান। তাই ব্যবসায়ী পরিবারগুলোয় এক ধরনের উৎসবের আমেজ শুরু হতো কদিন ধরেই। হালখাতার বিষয়টা অবশ্য অতি প্রাচীন। জমিদারের 'পুণ্যাহ' আদায়ের মতোই। তবে এর ভিন্নতা আছে। কৃষিপ্রধান বাংলায় নগদ পয়সা কৃষিজীবীদের হাতে আসত ফসলের মৌসুমে ফসল বিক্রি করে। নগদ পয়সার ব্যবহার তেমন ছিল না। পণ্যের বিনিময়ে পণ্য কেনা অথবা বাকিতে। কৃষিজী[illegible]র নগদ পয়সার সংস্থান থাকত না বলে বাকিতে সারা বছর পণ্য নিত [illegible] থেকে। বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ছোট ব্যবসায়ীরা বাকিতে [illegible] নিত।

পহেলা বৈশাখ নববর্ষের প্রথম দিনে সেই বাকির টাকা পুরো বা আংশিক শোধ করত ভোক্তারা। স্বাধীনতা পরবর্তী বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিবর্তন, প্রযুক্তির ব্যবহার; বাকিতে পণ্য বিক্রির প্রথা হ্রাস ইত্যাকার কারণে হালখাতার আবেদন নেই আর। হালখাতা ছিল নববর্ষের উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ। জীবনের জীর্ণ খাতাকে বদলে একটি নতুন খাতা খোলাই এর আদর্শিক লক্ষ্য—এভাবেও দেখা হতো। অর্থাৎ নতুনভাবে জীবন শুরু করাই যেন এর শর্তাবলী। এমনিতে বৈশাখের সঙ্গে সামন্ত সমাজের বৈষয়িক সম্পর্ক তীব্র। এ সম্পর্ক আবার পরস্পরবিরোধী শ্রেণি-পেশার মানুষের ব্যবসায়িক লেনদেনের। রাজার সঙ্গে প্রজার। সামন্ত প্রভুর সঙ্গে ভূমিদাসের। জমিদারের সঙ্গে রায়তের। ব্যবসায়ীর সঙ্গে ক্রেতার। সুদখোর মহাজনের সঙ্গে ঋণগ্রস্ত মজুরের। রাজার কর, জমিদারের খাজনা, ব্যবসায়ীর বকেয়া, মহাজনের দেনা পরিশোধের সময় নতুন বছরের শুরুর দিন পহেলা বৈশাখ। ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল কথা লাভ এবং লোভ। 'বাকির খাতায়

শূন্য থাক'—এই হলো উদ্দেশ্য। 'ক্ষেতের কোনা বাণিজ্যের দুনা'—এই লৌকিক প্রবাদ হয়েছে বাসি। 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী' হলো এ যুগের বাস্তবতা। আর এই ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে মূলত সম্পর্কটা বৈশাখের বেশ গভীর, গম্ভীর, বাণিজ্যিক। তবে এ কেবলই লাভালাভের বিষয় নয়। এ ভবিষ্যতের বাণিজ্যেও ক্ষেত্রকে করে আরও প্রসারিত। ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কে আনে আন্তরিকতা, সৌহার্দ্য, প্রীতিময়তা। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে নানা লোকাচার বা লৌকিক সংস্কৃতির নানা দিগন্ত, উৎসবের আমেজ। হালখাতা তারই অঙ্গ। হালখাতা মানেই বাণিজ্যিক হিসাব-নিকাশ হালনাগাদ। ব্যবসায়িক সালতামামি তো প্রতিটি মানুষেরই জীবনের অংশ। জীবনের খেরোখাতার নবায়ন হালখাতা। সামাজিক লেনদেনের সঙ্গে এই সংস্কৃতির সম্মিলন খুব গভীর। হালখাতায় থাকে ব্যবসায়ীর কায়কারবারের লেনদেন, বাকি-বকেয়া, উসুল আদায়—ইত্যাদির লিপিবদ্ধ রূপ। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় হালখাতা তো স্বাভাবিক রূপ। কাগুজে বা ধাতব মুদ্রার প্রচলন ঘটেনি যে যুগে, পণ্যের বিনিময়ে চলত পণ্য কেনাবেচা। এর হিসাব রাখা হতো রশিতে গেরো দিয়ে, মাচানের বাঁশের খুঁটিতে দাগ কেটে রেখে কিংবা অন্য কোনো দেহাতি পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতি আরও পরে তালের পাতায় লেখা বা তুলট কাগজের 'চিরকুট' বা হাত টোকার রূপ লাভ করে। এ ধারারই বিবর্তিত রূপ হালখাতা। নগদ পয়সার ব্যবহার না থাকায় বাকিতে পণ্য বিক্রি ছিল ব্যবসায়ের স্বাভাবিক অঙ্গ।

আর এ সবের হিসাব-নিকাশ চুকানোর জন্য গ্রামবাংলায় আনুষ্ঠানিকতার প্রচলন ছিল। হালখাতার মূল বিষয়টি অর্থনীতি ও বাণিজ্য হলেও এর সামাজিক পরিধি ছিল ব্যাপক। বকেয়া শোধের মধ্য দিয়ে ভোক্তা আত্মমর্যাদা বা আত্মতৃপ্তি যে পেতেন, অবয়বে তা ফুটে উঠত। ব্যবসায়ী বছরের শুরুতে অর্থ পেয়ে সারা বছরের বাণিজ্যিক পরিকল্পনা করে নিতেন। যিনি বকেয়া দিতে পারতেন না, ম্রিয়মান হলেও তাকে কেউ অসম্মান করত না। বরং অন্যদের সহানুভূতিই পেতেন। হালখাতা নিয়ে সে যুগে ব্যঙ্গ মন্তব্যও করা হয়েছে। প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী তো নববর্ষের দিন বাঙালি ব্যবসায়ীদের হালখাতা খোলার প্রসঙ্গে এ প্রথার অসারতা তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'নতুন বছরের প্রথম দিনে হিসাবের নতুন খাতা খোলার পর তা শুরু হয় ধার বা পাওনা দিয়ে, সারা বছরেই এই নতুন খাতায় হিসাব নতুন করে লেখা হলেও তা এক রকমের পুরনো অনুবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর মধ্য দিয়ে নতুনের আদর্শ প্রকাশিত হয় না।'

আসলে হিসাবের খাতা নতুন খোলা হলেও তাতে আবার পুরোনো প্রথাই অনুসৃত হতো। তারপরও হালখাতা নতুন বর্ষে ব্যবসায়ীদের কাছে নতুনভাবে ব্যবসা করার আদর্শ। চট্টগ্রাম শহরে ষাটের দশকে ব্যবসাকেন্দ্রিক অঞ্চল শুধু নয়, মহল্লার দোকানগুলোয়ও জাঁকজমকের সঙ্গে হালখাতার উৎসব হতো, মাইকে বাজত গ্রামোফোন রেকর্ডের গান। কানন দেবী, কমলা ঝরিয়া, কেএল সায়গল, কে মল্লিক, বেচু দত্ত, শৈল দেবী, কেদারনাথ ভট্টাচার্য, সুধীরলাল চক্রবর্তী, আব্বাসউদ্দিন আহমদের গ্রামোফোন রেকর্ডের গানের পাশাপাশি শামসাদ বেগম, সুরাইয়া, মোহাম্মদ রফি, লতার গানও বাজত। কীর্তনও বাজত। ব্যবসায়ীদের পছন্দের চেয়েও গান বাছাইয়ের ব্যাপারটা নির্ভর করত মাইকওয়ালার ওপর। তখনকার দিনে যারা মাইক ব্যবসা করতেন, তারা বক্তৃতা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাতেন। চট্টগ্রামে এ রকম গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান ছিল দুটি। সারা বছর রেকর্ড বিক্রি হলেও বৈশাখের পুজোতে বিক্রির হিড়িক পড়ত। বহদ্দারহাট, চকবাজার, বক্সিরহাট, চাকতাই, আন্দরকিল্লা, দেওয়ানবাজার, ফিরিঙ্গীবাজারের প্রায় দোকানে বৈশাখে ফুলের মালা দেখা যেত। এত ফুল সে সময় কোথা থেকে জোগান হতো জানা নেই। বাকি না থাকলেও হালখাতায় যোগ দিলে কিছু টাকা দেয়া হতো। এটা কি জমা হিসেবে থাকত, নাকি উপহার—জানা ছিল না। আমরাও দিয়েছি, দিতে হয় প্রথা জেনেই।

কোনো দোকানে কোনো বাকি না থাকলেও অতিথি হিসেবে সম্মানের কমতি ছিল না। বেশ আপ্যায়ন করে হাঁড়ি বা বালতি থেকে রসে ভেজা রসগোল্লা, জিলাপি, আমিত্তি পেটে এসে যেত। একজন বেতের টুকরিতে করে নিমকি; লাড্ডু দিয়ে যেত। কাঁচের গ্লাসে পানি ঢালার জন্য লোক সার্বক্ষণিক থাকত। খাবার শেষে বেরিয়ে আসার সময় পরিবেশনকারীদের দু-চার পয়সা বকশিশ দেয়ার রেওয়াজ ছিল। জুয়েলারি দোকানগুলোয় সমাদর বেশি মিলত। খাবার দাবারও উন্নত মানের। অনেক ক্রেতাকে উপহার হিসেবে তারা কলম; কলমদানি, নোটবুক দিতেন। মুসলিম দোকানগুলোয় দুপুরে মুরগিপোলাও খাওয়ানো হতো। সম্ভবত সেদিন গো-মাংস ব্যবহার হতো না। সঙ্গে বোরহানি, জর্দাও থাকত। অলঙ্কার কেনার রেওয়াজও ছিল নববর্ষের দিনে। দামে রেয়াত মিলত, তদুপরি ভেজাল না থাকার এক ধরনের নিশ্চয়তা। শহরের বইয়ের দোকানগুলোয়ও হালখাতা হতো। সেদিন নতুন গল্পের বইও কেনা হতো। সব সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে হালখাতার অনুষ্ঠানে সম্মিলিত হওয়ার দিন; একাত্তরের যুদ্ধকালে আর মেলেনি। সেদিন যুদ্ধজয়ের হালখাতা খুলতে হয়েছিল স্ট্রেঞ্জে বসে, শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে।

হালখাতা অনুষ্ঠানে হিন্দুদের দোকানে গণেশ বন্দনা হতো। মুসলমানদের দোকানে মিলাদ। ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি ছিল অবশ্য তা।

সারা বছরের হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে, আবার নতুন করে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণাই শুধু যোগাত না হালখাতা। মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, নারী-পুরুষে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, বন্ধন, সামাজিকতা, আন্তরিকতা সর্বোপরি মহামিলনের পথ তৈরি করে দিত। হালখাতা টিকে আছে এখনও এ দেশে স্বল্প পরিসরে। প্রীতি-সম্ভাষণ আজো বিনিময় হয়। বিশ্বায়ন আর মুক্তবাজারের যুগে হালখাতা সব সময়ই হাল করে রাখা হয় এখন। বর্ষ শেষের হিসাব-নিকাশ চুকাতে আর ধৈর্য ধরে না। তবু হালখাতার হালচাল থেকে যাবে বণিক সভ্যতায়।

❖ **মুহাম্মদ সবুর**
যুগান্তর ১৪ এপ্রিল ২০১৯

একটি সমাবর্তন ভাষণ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫ তারিখ ইউনিভার্সিটি অব নিবারেন আর্টস বাংলাদেশের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমি একটা ভাষণ দিয়েছিলাম। পৃথিবীটা কিছু বোঝার আগে খুবই দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। আমি লক্ষ করেছি তাই কম বয়সী তরুণ তরুণীদের সাথে কথা বলার সময়ও আমি বিশেষ কয়েকটা বিষয়ে আলাদাভাবে কথা বলতে শুরু করেছি। এই ভাষণটাতেও একই ব্যাপার ঘটেছে। আমার কথাকে কেউ কোনো গুরুত্ব দেবে কিনা জানি না। কিন্তু আমি ভাঙা রেকর্ডের মতো বলেই যাচ্ছি। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কয়েক হাজার তরুণ-তরুণীর সামনে যে কথাগুলো বলেছিলাম সেই কথাগুলো অন্যদেরকেও বলার ইচ্ছে করে। তাই আমার সেই ভাষণটির একটি দুটি লাইন ঘষা মাজা করে এখানে তুলে দিচ্ছি।

আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা,

আজকের দিনটি তোমাদের জীবনের খুবই আনন্দের একটি দিন! আমার খুবই ভালো লাগত যদি আমি এখানে দাঁড়িয়ে আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সমাবর্তনের সাথে তোমাদের এই অসাধারণ সমাবর্তনটির তুলনা করে কিছু একটা বলতে পারতাম। আমি সেটা করতে পারছি না, তার কারণ আমাদের কোনো সমাবর্তনই হয়নি! সমাবর্তনে কতো আনন্দ হয় আমি জানি না, গাউন পরে সমাবর্তন বক্তার বক্তব্য শুনতে কিংবা বন্ধুর সাথে ছবি তুলতে কেমন লাগে সেটাও আমি জানি না! কাজেই তোমাদের দেখে আমি যেরকম আনন্দ অনুভব করছি, একই সাথে সেরকম একটুখানি হলেও হিংসাও অনুভব করছি!

১.

আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই আজকে আমাকে তোমাদের সামনে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে। এখানে দাঁড়িয়ে আমার তোমাদের নতুন জীবনের স্বপ্নের কথা বলার কথা। একটি সময় ছিল যখন এই বিষয়টি ছিল অনেক কঠিন কারণ তখন স্বপ্ন দেখার বিশেষ কিছু ছিল না। আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী বছর আগে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম তখন আমার শিক্ষকেরা আমাকে বলেছিলেন, 'বাবারা, তোমরা পড়তে এসেছ খুব ভালো কথা, কিন্তু জেনে রেখো এখান থেকে পাশ করে তোমরা কিন্তু কোনো চাকরি পাবে না, এই দেশে তোমাদের জন্যে কোনো চাকরি নেই, কোনো কাজ নেই!' সেটি ছিল সদ্য স্বাধীন হওয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ। দেশটি তখন যত যুদ্ধবিধ্বস্তই হোক না কেন, সেটি কিন্তু ছিল নিজের একটি স্বাধীন দেশ। সেই দেশে

যখন ইচ্ছা আমি মাথা উঁচু করে রাস্তায় হাঁটতে পারব, পাকিস্তান মিলিটারি গুলি করে আমাকে মেরে ফেলবে না, রাজাকার আলবদর ধরে নিয়ে যাবে না। সেই আনন্দটিই আমাদের জন্যে এতো তীব্র ছিল যে চাকরি বা কাজের মতো বিষয়ের কোনও গুরুত্বই ছিল না! কাজেই এখন আমি যখন দেখি সরকারি চাকরিতে কোটার জন্যে তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু রাস্তায় নেমে আন্দোলন করে না, নিজেকে রাজাকার হিসেবে পরিচয় দেয় আমি অবাক না হয়ে পারি না।

আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, আমাদের সেই বাংলাদেশ থেকে তোমাদের বাংলাদেশ কিন্তু অনেক ভিন্ন। আমি আমার ছাত্রজীবন শেষ করে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করি তখন আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ১১০ ডলার। এখন তোমাদের মাথাপিছু আয় ১৭০০ ডলার থেকেও বেশি। (এটি কিন্তু যথেষ্ট নয়, ভিয়েতনাম আমাদের পরে, আমাদের থেকে খারাপ অবস্থা থেকে শুরু করে আমাদের থেকে অনেক ভালো অবস্থায় পৌঁছে গেছে!) যুক্তরাজ্যের প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারস তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে, যে সামনের বছরগুলোতে সারা পৃথিবীর যে তিনটি দেশ খুবই দ্রুতগতিতে প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখবে তার একটি হচ্ছে বাংলাদেশ! কাজেই এখন তোমাদের নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখানো খুবই সহজ, আমার আলাদা করে তোমাদের কিছু বলতে হবে না, শুধু মনে করিয়ে দিতে হবে, 'এটি তোমাদের বাংলাদেশ, তোমরা যেভাবে চাও সেভাবে এটিকে গড়ে তোলো!'

২.

আমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছি, তোমরাও উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছ, এটি অপূর্ব সুন্দর একটি দৃশ্য। কিন্তু এটি কী শুধুই সুন্দর একটি দৃশ্য নাকি তার চাইতে বেশি আরও কিছু? নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে পৃথিবীর বড় বড় গুণীজন অনেক ভেবেচিন্তে বলেছিলেন, 'এখন থেকে পৃথিবীর সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান।' মাঠের ফসল বা তেলের খনি নয়, যুদ্ধাস্ত্রের কারখানা বা ইলেকট্রনিক ইন্ডাস্ট্রিও নয়, পৃথিবীর সকল সম্পদ থেকেও বড় সম্পদ হচ্ছে–জ্ঞান। গত চার বছর পরিশ্রম করে তোমরা সবাই সেই জ্ঞান অর্জন করেছ বলে আজ তোমরা আমার সামনে বসে আছ। যার অর্থ, আমি যখন তোমাদের দিকে তাকাই আমি আসলে একটা জ্ঞান ভাণ্ডারের দিকে তাকাই–সোনার খনি থেকেও মূল্যবান সম্পদের দিকে তাকাই। এই সম্পদের মূল্য কতো? শুধু টাকা বা ডলার দিয়ে এই সম্পদের মূল্য ঠিক করা যাবে না, এটি তার থেকে অনেক বেশি, কারণ এটি নির্ভর করে তোমাদের স্বপ্নের উপর। তোমাদের কল্পনাশক্তির উপর। তোমাদের আগ্রহের উপর, উৎসাহের উপর। তোমাদের পরিশ্রমের উপর। দেশের জন্যে তোমাদের ভালোবাসার উপর।

৩.

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের তিনটি করে মা থাকে। একটি জন্মদাত্রী মা, একটি মাতৃভাষা এবং আরেকটি হচ্ছে মাতৃভূমি। এটি ফেব্রুয়ারি মাস, একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু আমাদের নয়, এখন সারা পৃথিবীর মাতৃভাষা-দিবস। আমাদের মাতৃভাষাটি কতো মধুর সেটি জানতে চাও? খুব সহজ একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদের মনে করিয়ে দিতে পারি। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম লাইনটি হচ্ছে, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। এর শেষ তিনটি শব্দ দিয়েও একটি বাক্য হতে পারে, সেটি হচ্ছে, 'আমি তোমায় ভালোবাসি'। এই তিনটি শব্দ দিয়ে পারমুটেশান করে সব মিলিয়ে আমরা ছয়ভাবে বাক্যটি লিখতে পারি:

'আমি তোমায় ভালোবাসি', 'আমি ভালোবাসি তোমায়', 'তোমায় আমি ভালোবাসি', 'তোমায় ভালোবাসি আমি', 'ভালোবাসি আমি তোমায়', 'ভালোবাসি তোমায় আমি'!

তোমরা কী লক্ষ করেছ, এই ছয়টি বাক্যের প্রতিটি কিন্তু শুদ্ধ বাক্য?

এবারে ইংরেজির সাথে তুলনা করি? I Love you এটাকে কী অন্য কোনোভাবে বলা সম্ভব? I you Love? Love I you কিংবা Love you I? কিংবা You I love? You love I? চেষ্টা করে দেখো, মূল বাক্যটি ছাড়া অন্য কোনোটি কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়! এই ছোট উদাহরণটি দিয়েই কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে, আমাদের মাতৃভাষা কতো সাবলীল, কতো ছন্দময়। (সে কারণে মনে হয় বাঙালি তরুণ তরুণীদের মাঝে কবি সবচেয়ে বেশি!) এরকম অনেক উদাহরণ দেয়া সম্ভব। তোমরা নিজেরাই সেগুলো খুঁজে বের করতে পারবে। ইংরেজি ভাষার আগ্রাসনে আমরা যখন ব্যতিব্যস্ত, তখন ভাষার মাসে প্রিয় মাতৃভাষার জন্যে কী আমরা একটুখানি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি না?

আমাদের আরেকজন মা হচ্ছে আমাদের মাতৃভূমি। তোমরা জানো এই মাতৃভূমি কেউ এমনি এমনি আমাদের হাতে তুলে দেয়নি, অনেক মূল্য দিয়ে এটি আমাদের কিনতে হয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর লন্ডন টাইমস লিখেছিল, 'যদি রক্ত স্বাধীনতার মূল্য হয়ে থাকে তাহলে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ মূল্যে স্বাধীনতা কিনেছে'। সেই মাতৃভূমি হচ্ছে আমাদের আরেকটি মা। আমার জন্মদাত্রী মা যদি বৃদ্ধা হয়, অশিক্ষিতা হয়, অসুন্দর হয়, সাধাসিধে হয় তবুও তাকে ফেলে যেরকম একজন কমবয়সী স্মার্ট সুন্দরী মহিলাকে আমরা মা ডাকি না, দেশের বেলাতেও সেরকম। আমার দেশটি যদি দরিদ্র হয়, দুঃখী হয়, সাধাসিধে হয়, দুর্নীতিতে জর্জরিত হয়, তারপরও আমি আমার নিজের দেশ ছেড়ে আরেকজনের ঐশ্বর্যশালী, চকচকে, জৌলুসে ভরা একটি দেশকে নিজের মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করে ফেলি না। আমাদের মা'দের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে, আমরা কী নিজেদের জিজ্ঞেস করতে পারি, আমি কি আমার মায়ের সেই দায়িত্ব পালন করেছি? আমার জন্মদাত্রী মা, আমার মাতৃভাষা এবং দেশ মাতৃকা?

৪.

আমাকে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা নিশ্চয়ই ভেবেছেন আমি তোমাদের নতুন জীবনের সন্ধিক্ষণে কিছু উপদেশ দিতে পারব। আমি সেটা কতোটুকু পারব জানি না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার কিছু অংশ তোমাদের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে পারি। যে বিষয়গুলো শেখার জন্যে আমার চুলে পাক ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে তোমরা অনেক কম বয়সেই সেই অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারবে। তুমি বা তোমরা তোমাদের নিজের জীবনে সেটি ব্যবহার করবে কি করবে না সেটা তোমাদের নিজেদের ব্যাপার!

আজ থেকে প্রায় দুই যুগ আগে কার্নেগী মিলন ইউনিভার্সিটিতে হার্বার্ট সাইমন নামে একজন অনেক বড় মানুষের সাথে আমার সময় কাটানোর সুযোগ হয়েছিল। তোমরা যারা তার নাম শুনেছ তারা জানো, তিনি ১৯৭৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। আজকাল 'আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স' নামে যে শব্দটি আমরা সারাক্ষণ শুনতে পাই তিনি প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। আমার দীর্ঘজীবনে আমি যে কয়জন অস্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তার মানুষ দেখেছি তিনি ছিলেন তার একজন। তার সাথে কথা বলার সুযোগটি ছিল আমার জন্য একটি অসাধারণ

অভিজ্ঞতা। অনেক কথার মাঝে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি ছিল কিন্তু খুবই বিচিত্র, যেটা আজকে এখানে আমি তোমাদের বলতে চাই।

যে সময়ের কথা বলছি তখনো ইন্টারনেটের প্রচলন হয়নি, ই-মেইল মাত্র ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। আমরা সবাই তখন ই-মেইল নিয়ে খুব উত্তেজিত, যে চিঠিটি পৌঁছাতে আগে এক সপ্তাহ লেগে যেতো সেটি এখন মুহূর্তে চলে যাচ্ছে, উত্তেজিত না হয়ে উপায় কী? আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম হার্বাট সাইমন কিন্তু ই-মেইল নিয়ে মোটেও উত্তেজিত নন তিনি বরং খানিকটা বিরক্ত! তিনি বললেন, হঠাৎ করে সবাই আমাকে ই-মেইলে রাজ্যের তথ্য পাঠাতে শুরু করেছে! আমার যখন প্রয়োজন হবে আমি তখন সেই তথ্য খুঁজে নেব। কিন্তু অন্যেরা কেন না চাইতেই আমাকে অপ্রয়োজনীয় তথ্য পাঠাবে? আজ থেকে বিশ বছর আগে মানুষেরা তখনো তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত হতে শুরু করেনি। কিন্তু হার্বাট সাইমন তখনই বিপদটি টের পেয়েছিলেন, তিনি নিজের মতো থাকতে চান, অন্যেরা কেন তার নিজের স্থানটুকুতে নাক গলাবে?

আমার বয়স কম ছিল, খানিকটা গোঁয়ারের মতো এতো বড় একজন মানুষের সাথে তর্ক করে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে নেটওয়ার্কিং বিশাল একটা ব্যাপার, তথ্যের অবাধ প্রবাহ হচ্ছে সভ্যতার চিহ্ন, আমাদের এটা গ্রহণ করতে হবে। হার্বাট সাইমন আমার কথাকে কোনো গুরুত্ব দেননি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন–আজ প্রায় পঁচিশ বছর পরে হঠাৎ করে আমি হার্বাট সাইমনের সেই কথাগুলোর মর্ম বুঝতে শুরু করেছি। আমাদের চারপাশে তথ্য প্রযুক্তির অতিকায় দানবেরা–ফেসবুক, গুগল, মাইক্রোসফট, আমাজন, কিংবা আপেল–আমাদের সবাইকে তাদের নেটওয়ার্কে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে! ইন্টারনেটের কানাগলিতে আমাদের একাধিক প্রজন্ম পুরোপুরি হারিয়ে গেছে। চারপাশে শুধু তথ্য আর তথ্য। প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক, হয় আমি সেই তথ্য দিচ্ছি না হয় সেই তথ্য নিচ্ছি। আমার নিজের সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তথ্য প্রযুক্তির অতিকায় প্রতিষ্ঠানগুলো তার চাইতে অনেক বেশি জানে। সোস্যাল নেটওয়ার্ক নামের বিচিত্র এক মাদকে সবাই আসক্ত। ডাইনিং টেবিলে বসে ছোট ছেলেটি সিগারেট খেলে বাবা মায়েরা চমকে উঠেন, কিন্তু স্মার্ট ফোনে ফেসবুকে মগ্ন হয়ে থাকলে তারা কিছুই মনে করেন না, যদিও দুটোর মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই, দুটিই কিন্তু আসক্তি। একবার আক্রান্ত হলে দুটোর আরোগ্যের জন্যে একই ধরনের নিরাময় কেন্দ্রে যেতে হয়।

কাজেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে বিষয়টি আমি তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা কী স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, নোটবুক এবং টেলিভিশনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকবে, নাকি তোমার পাশে বসে থাকা রক্তমাংসের টগবগে জীবন্ত একজন মানুষের চোখের দিকে তাকাবে? আমার আজকের বক্তব্য থেকে তোমরা যদি একটা মাত্র বাক্য মনে রাখতে চাও, তাহলে আমার এই বাক্যটি মনে রেখো: 'তোমরা যত ইচ্ছা প্রযুক্তিকে ব্যবহার কর, কিন্তু প্রযুক্তি যেন কখনো তোমাদের ব্যবহার করতে না পারে।'

৫.

তোমরা বাংলাদেশের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বের হতে যাচ্ছ। তোমরা কী লক্ষ করেছ তোমার বিদ্যাপীঠটিকে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়? একটি গ্রামের নয়, একটি শহরের নয়, একটি বিভাগের নয়, এমনকি একটি দেশেরও নয়–এটি সারা বিশ্বের একটি বিদ্যালয়। ইংরেজিতে এই বিদ্যাপীঠটি আরো বেশি ব্যাপক, ইউনিভার্সিটি–অর্থাৎ পুরো ইউনিভার্স বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিদ্যাপীঠ। এই নামকরণটি কিন্তু শুধু শুধু করা হয়নি, যখন একটি বিশ্ববিদ্যালয় কল্পনা করা হয় সেখানে কিন্তু সংকীর্ণতার কোনো স্থান নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হতে হয় সত্যিকার অর্থে সারা বিশ্বের নাগরিক। দেশ, কাল, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায় এরকম কোনো বিভেদ লালন করে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিংবা ছাত্রী হওয়া যায় না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিংবা ছাত্রী হিসেবে তুমি নিজেকে সারা পৃথিবীর সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র কিংবা ছাত্রী হিসেবে কল্পনা করে নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হয়ে তোমরা নিশ্চয়ই আরো একটি বিষয় লক্ষ করেছ, এটি কিন্তু একটি ট্রেনিং সেন্টার নয়। প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়ে কিছু দক্ষতা তোমাদের শিখিয়ে দেয়াই যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে অনেক কম সময়ে তোমাদের সেগুলো শিখিয়ে পড়িয়ে নেয়া যেতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য তোমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে শেখানো। লিবারেল আর্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে তোমাদের জন্যে এই কথাটি অন্যদের থেকে আরো অনেক বেশি সত্যি।

আজকে তোমরা আমার সামনে বসে আছ কারণ তোমরা সবাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার একটা ধাপ শেষ করেছ। আমি এখন তোমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে চাই। তোমরা অনেকেই হয়তো তথ্যটি জানো কিন্তু হয়তো পুরোপুরি বিশ্বাস করনি। তথ্যটি হচ্ছে, তোমার এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সার্টিফিকেটটাই কিন্তু যথেষ্ট নয়, জীবনে সাফল্যের জন্যে এর সাথে আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। তোমরা অনেকেই সেগুলো এর মাঝে শিখে গেছ, যারা শিখনি তারা জীবনে ধাক্কা খেতে খেতে শিখে যাবে। জীবনের জন্যে যদি প্রস্তুতি নিতে চাও তাহলে ব্যর্থতার জন্যে প্রস্তুতি নাও। আমি যদি আমার নিজের জীবনের পিছন দিকে তাকাই আমি অবাক হয়ে দেখি সেখানে সাফল্য বলতে গেলে নেই–বেশিরভাগই ব্যর্থতা! মাঝে মাঝে মনে হয় যেখানেই হাত দিয়েছি সেখানেই ব্যর্থ হয়েছি। ব্যর্থতার মাঝে কোনো আনন্দ নেই, গৌরব নেই কিন্তু এটি জীবনের একটা অংশ। যার জীবনে ব্যর্থতা নেই বুঝতে হ[illegible] সে তার জীবনে নতুন কিছু করার চেষ্টা করেনি। ব্যর্থতা আসবে কিন্তু সে[illegible]র্থতায় হতাশ না হয়ে লেগে থাকাই হচ্ছে জীবন। মনে রেখো, স্বপ্ন সফল হ[illegible] জীবন নয়, স্বপ্নের জন্যে লেগে থাকা হচ্ছে জীবন। সেই জীবন কিন্তু খু[illegible] ছোট, দেখতে দেখতে তোমার জীবনটুকু শেষ হয়ে যাবে। কাজেই এই ছোট সময়টি যেন অর্থপূর্ণ হয়, আনন্দময় হয় সেটি তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে। আমি আশা করছি জীবনকে পরিপূর্ণ করতে গিয়ে, তোমরা ক্লাসরুমে যেটুকু শিখেছ ক্লাসরুমের বাইরে শিখেছ তার চাইতে আরো অনেক বেশি।

এই চমৎকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে একজন চমৎকার পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে আজ তোমরা বের হয়ে যাচ্ছ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মশালটি তোমাদের হাতে। আমরা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি দেখার জন্যে, সেই মশালের আলোতে তোমরা কতোটুকু জায়গা আলোকিত করতে পার।

সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা।

❖ লেখক : অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা ট্রিবিউন, ২ মার্চ ২০১৯

কৃষক ও সরকারের মধ্যস্থতায় নির্ধারিত হোক কৃষিপণ্যের দাম

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে স্বীকৃত। কৃষিপণ্য নানা রকমের হলেও প্রাধান্য ধানের। ধান থেকে চাল–ভাতখেকো বাঙালি গম বা আলুর, কৃচিৎ ভুট্টার মতো খাদ্যের হিসাব মানেনি। আইয়ুব খান একবার বাঙালিকে ভুট্টা খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। খাদ্যবিজ্ঞানীর মতে, ভাতের চমৎকার বিকল্প আলু। ইউরোপে আলুর কদর কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু না, বাঙালি এসব তত্ত্ব কথায় ভোলে না, ভাতেই তার শান্তি–হোক তা পান্তা বা ধোঁয়া ওঠা গরম, মাঠে বা ডাইনিং টেবিলে।

সেই ভাতের মূল উপাদান অর্থাৎ জমির ফসল ধান, কৃষকের শ্রমের উৎপাদন, তার মূল্যমান নিয়ে, কৃষকের লভ্যাংশ নিয়ে আলোচনা ও লেখালেখি, হিসাব-নিকাশ ও মূল্যায়ন কম নয়। কারণ একটাই কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় আপাতত ধান।

কৃষক জমিতে ধান উৎপাদন করে যেমন দেশের মানুষের অন্ন জোগায়, তেমনি নিজের অন্ন ও জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করে উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশে। উৎপাদনের নিয়ম এমনই। কিন্তু আমাদের বড় সমস্যা হলো, কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে শিল্পপণ্যের নিয়মটা খাটে না। শিল্পপতিরা এ ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে। তাদের অর্থবিত্ত তাদের জন্য এই সুবিধাজনক অবস্থান নিশ্চিত করেছে।

শিল্পপণ্যের প্রকৃত উৎপাদক কারখানা শ্রমিক। কিন্তু পণ্যের পুরো এখতিয়ার কারখানা মালিকের। পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও লভ্যাংশ তথা মুনাফা সবই মালিকের। যদি তুলনা টানা যায় তাহলে বলতে হয়, কারখানার মালিক ও জমির মালিক কৃষকের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। কিন্তু বাস্তবে আছে। এবং এটাই আছে যে শিল্পপণ্যের উৎপাদন–মালিক ধনিক ও অতিধনিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে জমির ফসল উৎপাদক নানাভাবে পীড়িত, শোষিত, অর্থনৈতিকভাবে দুস্থ। তার হাহাকার–'উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছি না। সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবন দুর্বিষহ।'

দুই.

কেন এ বৈপরীত্য, কেন এ বৈষম্য, শাসনযন্ত্র কেন দেশের মূল উৎপাদক কৃষকের জীবনযাপন ও অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি এতটা উদাসীন। কেন তাদের প্রতি নিরন্তর অবহেলা? কেন মধ্যস্বত্বভোগীদের যুক্তিহীন মুনাফাবাজি বন্ধ করার ক্ষেত্রেও সরকারের উদ্যোগ নেই, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নেই।

বছর কয় আগে মেহেরপুর যাওয়ার পথে দেখেছিলাম, রাস্তার দুই পাশে ধানিজমিতে মাইলের পর মাইল তামাক পাতার সমারোহ। তখনই ভেবেছি, এ সর্বনাশা প্রবণতা বন্ধ করতে রাষ্ট্রযন্ত্র তৎপর নয় কেন? আজ যদি বঞ্চিত কৃষকসমাজ একাট্টা হয়ে বলে, ধানের বদলে আমরা তামাক চাষ করব, তাহলে এর পরিণামটা কী হবে। কিংবা যদি বলে, অন্য কোনো অপ্রধান ফসলের চাষ করব, তাহলে বাঙালি কী খেয়ে বাঁচবে?

তবে প্রধান খাদ্যটি কি পাল্টাতে বাধ্য হবে? নাকি আমদানিতে সে ঘাটতি পূরণ করা হবে?

ধান চাষি কৃষকদের দুরবস্থার বিবরণে সাংবাদিক মহল যে চিত্র তুলে ধরেছে তা রীতিমতো হতাশাব্যঞ্জক। কয়েকটি শিরোনামে তা পরস্ফুট। চিত্রটি দেশের সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ধৃত : 'কৃষক বাঁচাতে জরুরি ধান ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান', 'কৃষকের ধান ও রোল মডেল রাষ্ট্রের নির্লিপ্ততা', 'কৃষককে বাঁচাতেই হবে'। পাশাপাশি অন্য হিসাব–'বছরে খরচ বাড়ছে এক টাকা, দাম কমছে ছয় টাকা।' অবস্থাটা তাহলে কোথায় দাঁড়াল?

এ বছর যখন ধান ওঠে তার পরপরই ছিল ঈদ। স্বভাবতই সংসারে বাড়তি খরচ। বাড়তি খরচ জোগানো দূরে থাক, নিয়মিত খরচই দূরে থেকে যাচ্ছে। তাই তাদের হা-হুতাশ, 'হামার ঈদ কেমন করি হবে', 'কেনাকাটা এখন অসম্ভব ব্যাপার', 'এ কষ্ট কোনো দিনই ভুলতে পারব না'। এর মধ্যে এক সাংবাদিকের প্রতিবেদনের শিরোনাম : 'আতাবুর-গফুরদের কষ্টের দিনলিপি'। শেষোক্ত

প্রতিবেদনটি যশোর-খুলনা থেকে। আর পূর্বোক্ত শিরোনাম উত্তরবঙ্গ এবং কিশোরগঞ্জের হাওরাঞ্চল থেকে।

এদের প্রত্যেকের মুখে একই কথা। ধান চাষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, বিশেষ করে ধান কাটা ও ধান মাড়াইসহ যে খরচ আর ধান বেচার যা দাম তা কোনোভাবেই হিসাবে মেলে না। লাভ দূরে থাক, ধান ঘরে তোলার দাম পর্যন্ত ওঠে না সরকার নির্ধারিত ধানের মূল্যে। প্রশ্ন, তাহলে ধান চাষ করে কৃষক কিভাবে সংসার চালাবে, বাড়তি খরচ কোত্থেকে দেবে কৃষক? ঋণ করে? ঋণ করে যে চাষের দাম মেটাতে হয়, সে পণ্য কেন সে উৎপাদন করবে?

তিন.

ধান চাষ ও ধান ফলনে খরচের যেসব পরিসংখ্যান পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে ধান চাষের খরচ এবং ধান বিক্রির প্রাপ্তিতে বিরাট বৈষম্য, বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা পরস্ফুট। তদুপরি দেখা যাচ্ছে, প্রতিবছর কৃষি মজুরি ও সেচ খরচ বাড়ছে সবচেয়ে বেশি। স্বভাবতই কৃষক বিপাকে। এ সমস্যা আরো বেশি বর্গাচাষিদের ক্ষেত্রে। কারণ যে কৃষক নিজের জমি চাষ করে সে তুলনায় যে অন্যের জমি বর্গাভিত্তিতে চাষ করে তার খরচ অনেক বেশি জমির মালিককে তার পাওনা বুঝিয়ে দিতে হয় বলে।

এ সমস্যা দূর করার পথে অনেক বাধা। প্রথমত, ধানের দাম নির্ধারণ। সরকার ধানের যে দাম নির্ধারণ করে দেয়, তা কখনো যদি কৃষকের হিসাবে গ্রহণযোগ্যও হয়, তাহলেও বিকিকিনির প্রক্রিয়ায় ও লেনদেনে অশিক্ষিত-নিরক্ষর কৃষককে প্রায়ই লোকসানের মুখে পড়তে হয়। কাজেই প্রত্যাশিত ফল মেলে না বহু শ্রমে 'বাম্পার' ফলন নিশ্চিত করা সত্ত্বেও। কারণ এর মধ্যে থাকে অনেক ফাঁকফোকর।

তা ছাড়া নিজের ভালো নিজে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা অনেক দরিদ্র ও নিরক্ষর কৃষকের থাকে না বলে তারা প্রায়ই প্রতারণা ও চাতুরির সম্মুখীন হয়; বিশেষ করে যখন তাদের ধান পৌঁছে দিতে হয় সরকারি গুদামে। সেখানে অনেক অদৃশ্য হাতের কারসাজি। ধান বিক্রেতা কৃষক সেখানে অসহায়। লেনদেনে ঘাটতি বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। তাই আমাদের দাবি, কৃষকের প্রতি সুবিচার করতে চাইলে সরকারকে উৎপাদকের কাছ থেকে সরাসরি কেনার পদ্ধতি চালু করতে হবে। সেটা ধান বা যেকোনো পণ্য হোক।

তার আগে প্রথম কথাটিতে আসি। শিল্প-কারখানার পণ্যের দাম কি সরকার নির্ধারণ করে দেয়? না, দেয় না। তাহলে ধানের দাম সরকার নির্ধারণ করবে কেন, করবে কৃষক তার খরচের ওপর লভ্যাংশ যোগ করে। এ লভ্যাংশের হার নিয়ে সরকারের সঙ্গে যুক্তিতর্ক, দর-কষাকষি চলতে পারে। এবং শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হোক দাম। যেমন–দৃষ্টান্তস্বরূপ ওষুধ উৎপাদনের খুচরা মূল্য নির্ধারণ। এর একটি হিসাব-নিকাশ আছে। আছে যুক্তি ও বিশ্বব্যাপী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায়। আমি ভাবতে পারছি না, মূল্য নির্ধারণের এ দাবি কেন কৃষক এযাবৎ তোলেনি। কিংবা কৃষকবান্ধব রাজনীতিকরাই বা এ দাবি তোলেননি কেন? তাহলে তো সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের সমাধান হয়ে যায় অতি সহজেই। সরকার যেমন ওষুধের মূল্য নির্ধারণে ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চালু করেছে, তেমনি কৃষিপণ্যের জন্য অধিদপ্তর খুলতে পারে, যেখানে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে শুধু ধান নয়, সব কৃষিপণ্যেরই বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হবে।

কিন্তু মূল্য নির্ধারিত হলেই চলবে না, কৃষক যাতে সেই নির্ধারিত মূল্য পায়, তাতে কোনো বাধাবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় অর্থাৎ সৃষ্টি করা না হয় তেমন প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কৃষক নিজের উৎপাদিত ফসল অর্থাৎ ধান বিক্রি করতে গিয়ে হয়রানির শিকার না হয়। সে জন্য আমরা বলি–মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদিত ধান বিক্রিতে যেন কৃষককে আবার মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে না হয়। তাই স্লোগান–'কৃষকের খোলাম থেকে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে নির্ধারিত মূল্যে ধান কেন, তাৎক্ষণিক মূল্য পরিশোধ করো।'

এর মধ্যে কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর অনুপ্রবেশ ঘটতে দেওয়া চলবে না। মিল মালিককে ধান কিনতে হলে একই পদ্ধতিতে, একইভাবে নির্ধারিত মূল্যে ধান কিনতে হবে কৃষকের খোলাম থেকে। আরো একটি বিষয় বিবেচ্য! কৃষককে যেমন বাম্পার ফলনে উৎসাহিত করা হয়, তেমনি তার শ্রমের মূল্য দিতে হবে তার জীবনযাপনের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করে। আর সে বাম্পার ফলনে যদি দেশের চাহিদা পূরণ হয়, তাহলে সরকারকে অপ্রয়োজনীয় চাল আমদানি বন্ধ করতে হবে।

আমরা জানি, আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই কৃষকের ভালো-মন্দ হিসাব-নিকাশ না করে ব্যবসায়ীর স্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ অব্যবস্থা অনেক দেখেছি পাকিস্তান আমলে, দেখেছি এর পরও। ইরিধান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কীটনাশক আমদানিতে দেখা গেছে অনেক অনিয়ম, বিষাক্ততার মাত্রায় নিষিদ্ধ কীটনাশক আমদানি ও ছাড়পত্র পেয়ে গেছে বিশেষ ব্যবস্থায়। পরিণামে মারা গেছে দুর্বল প্রজাতির অসহায় মৎস্যকুল।

শেষ কথা হলো, রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তব্য হলো চাষবাসে কৃষি ও কৃষকবান্ধব নীতি অনুসরণ–সে নীতি হলো 'কৃষক বাঁচাও, মধ্যস্বত্বভোগী ঠেকাও' ধারার। মধ্যস্বত্বভোগীরা সেই ১৮ শতক থেকে কৃষকদের শোষণ শাসনের সহযোগী হয়েছে জমিদার মহাজনদের অনুসরণ করে। একালে তার চেহারা ভিন্ন হলেও শোষক চরিত্র একই রকম। এ ব্যবস্থার অবসান চাই।

❖ **আহমদ রফিক**
কবি, গবেষক, ভাষাসংগ্রামী
কালের কণ্ঠ ১৩ জুন ২০১৯

ব্লু-ইকোনমি : নতুন দিগন্তের হাতছানি

সমুদ্রে অবস্থিত বিশাল জলরাশি এবং এর তলদেশের বিশাল সম্পদকে কাজে লাগিয়ে এদেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয়েছে ব্লু-ইকোনমির মাধ্যমে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এদেশের কাঙ্ক্ষিত, দ্বি-অংকের জিডিপি প্রবৃদ্ধিসহ, অন্যান্য লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য বিশাল এই সমুদ্র সম্পদকে অতিদ্রুত আমাদের অর্থনীতির মূল ধারায় সংযুক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, এ দেশের সমুদ্র সীমায় প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। পানির নিচের এসব সম্পদকে আমরা সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারলে আমাদের অর্থনীতির গতি আরো বাড়বে।

তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ভিশন-২০৪১ অর্জনে ব্লু-ইকোনমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অবদান মাত্র ৯ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অথবা ৬ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিদ্রুত সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমাকে অর্থনীতির কেন্দ্রে রূপান্তর করে বাংলাদেশ সামুদ্রিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অবদান কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ব্লু-ইকোনমিকে আমাদের অর্থনীতির সঙ্গে একীভূত করতে গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে আরও বেগবান করার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় অথবা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় একটি উইং খোলার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট) রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মো. খুরশেদ আলম জানান সমুদ্র অর্থনীতি বা ব্লু-ইকোনমি ঘিরে নতুন স্বপ্ন দেখছে দেশ। সাগরের বিশাল জলরাশি এবং এর তলদেশের অফুরন্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটানোর প্রক্রিয়া চলছে। সমুদ্র জয়ের পর সেই বিপ্লব বাস্তবায়নের রোডম্যাপ এগিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাংলাদেশ।

ইতিমধ্যে সামুদ্রিক অর্থনীতি বিকাশের জন্য ২৬টি কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে সরকার। এগুলো হলোঃ শিপিং, উপকূলীয় শিপিং, সমুদ্র বন্দর, ফেরির মাধ্যমে যাত্রীসেবা, অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহন, জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ রিসাইক্লিং শিল্প, মৎস্য, সামুদ্রিক জলজ পণ্য, সামুদ্রিক জৈবপ্রযুক্তি, তেল ও গ্যাস, সমুদ্রের লবণ উৎপাদন, মহাসাগরের নবায়নযোগ্য শক্তি, ব্লু-এনার্জি, খনিজ সম্পদ (বালি, নুড়ি এবং অন্যান্য), সামুদ্রিক জেনেটিক সম্পদ, উপকূলীয় পর্যটন, বিনোদনমূলক জলজ ক্রীড়া, ইয়টিং এবং মেরিনস্, ক্রুজ পর্যটন, উপকূলীয় সুরক্ষা, কৃত্রিম দ্বীপ, সবুজ উপকূলীয় বেল্ট বা ডেল্টা পরিকল্পনা, মানবসম্পদ, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং নজরদারি এবং সামুদ্রিক সমষ্টি স্থানিক পরিকল্পনা (এমএসপি)।

খুরশেদ আলম জানান, প্রত্যেকটি কার্যক্রমকে আরও কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। প্রশিক্ষিত, দক্ষ এবং শিক্ষিত মানবসম্পদ অর্থনীতির চালিকাশক্তি, যা বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লবে সহয়তা করবে। দক্ষ প্রকৌশলী, নৌবাহিনী, প্রযুক্তিবিদ, মৎস্য প্রযুক্তিবিদ, জৈব প্রযুক্তিবিদ এবং অন্যান্য বিভিন্ন পেশায় অভিজ্ঞ মানুষদের হাত ধরে ব্লু-ইকোনমির সফলতা আসাতে পারে।

বর্তমান সরকার ব্লু-ইকোনমির সুযোগগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার উপর বিশেষ নজর দিচ্ছে। সমুদ্র গবেষণা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য সাম্প্রতিক কালে সরকার বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং একটি মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেছে।

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা, পর্যটন, সামুদ্রিক পরিবহন এবং তেল গ্যাস অনুসন্ধানসহ ব্লু-ইকোনমির বিভিন্ন সম্ভবনাকে আবিষ্কার করে কাজে লাগাতে একটি 'টেকসই ব্লু-ইকোনমি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' গঠন করার জন্য বাংলাদেশ মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিএমসিসিআই)-এর সভাপতি সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানান।

২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে প্রথমে মিয়ানমার এবং পরে ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি হয়। এতে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ১৮৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার ওপর আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম উপকূল হইতে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানে অবস্থিত সকল প্রকার প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদের উপর আমরা একচ্ছত্র মালিকানা লাভ করি।

এ সমুদ্রসীমায় তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ, মৎস্য আহরণ এবং সমুদ্রসীমার নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে কৌশলগত পরিকল্পনা নেওয়া হয় ২০১৪ সালে। বিশ্ব অর্থনীতিতে তিন থেকে পাঁচ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকান্ড হচ্ছে সমুদ্র ঘিরে। বিশ্বের ৪৩০ কোটি মানুষের ১৫ শতাংশ প্রোটিনের জোগান দিচ্ছে সামুদ্রিক মাছ ও উদ্ভিদ।

৩০ শতাংশ গ্যাস ও জ্বালানি তেল আসছে সাগর থেকে। সুনীল অর্থনীতির মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা এবং মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

❖ একেএম কামাল উদ্দিন চৌধুরী

ক্যাম্পাসলাইভ২৪.কম ৩০ মে ২০১৯

রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা

বিষয় : নৈতিকতা উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা

মোছা. মনিরা পারভীন মনি

সদস্য : ১২৭৯/২০১৭

[মেধা লালন প্রকল্পের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২০১৮-'১৯ তে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত ৩টি রচনা নবীন পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবারের সংখ্যায় দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাটি প্রকাশ করা হলো]

আমাদের জাতিসত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বা আমাদের এই আধুনিক সত্তাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমাদের যুবসমাজের নৈতিকতার দিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। নৈতিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো ধর্মীয় শিক্ষা।

ভূমিকা :

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে
এ বয়সে তাই
নেই কোনো সংশয়–
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।
[আঠারো বছর বয়স–সুকান্ত ভট্টাচার্য]

আমাদের যুবসমাজ জাতির আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল। জাতীয় জীবনে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ, যে কোনো আপদকালীন মুহূর্তে যুবসমাজ অগ্রণী এবং সাহসী ভূমিকা পালন করতে পারে। '৫২-তে, '৫৪-তে, '৬৯-এ, '৭১-এ এবং '৯০-এর উত্তাল দিনে দেশবাসীকে তারা আশা দিয়ে, ভরসা দিয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে। এ ত্যাগ ও সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমাদের বর্তমান যুবসমাজ দেশ গঠনে স্মরণীয় ভূমিকা রাখতে পারে।

নৈতিকতা কী : নৈতিকতা ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Morality'. ইংরেজি Morality শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Moralitas থেকে, যার অর্থ সঠিক আচরণ বা চরিত্র। সক্রেটিস বলেছেন, 'সৎ গুণই জ্ঞান' (Virtue is knowledge)। নৈতিকতা হলো মানুষের আন্তর্নিহিত ধ্যান-ধারণার সমষ্টি যা মানুষকে সুকুমার বৃত্তি অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করে। নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ মানসিক বিষয়। এটি হলো মানব মনের উচ্চ গুণাবলি। নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ একান্তভাবেই মানুষের হৃদয়-মন থেকে উৎসারিত। নৈতিকতা বা নীতিবোধের বিকাশ ঘটে মানুষের ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বোধ বা অনুভূতি থেকে।

যুবসমাজ কী : যুবসমাজ বলতে কোনো নির্দিষ্ট স্থান, দেশ বা রাষ্ট্রের তরুণ প্রজন্মকে বোঝায়। অন্যথায় সকল যুবকদের বুঝতে যুবসমাজ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

যুবসমাজ ও নৈতিকতা : শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড হলে আমি বলব নৈতিকতা সম্পন্ন যুবসমাজ হলো জাতির হৃৎপিন্ড। তাই আদর্শ জাতি গঠন করতে হলে আগে জাতির যুবসমাজকে নৈতিকতা সম্পন্ন শিক্ষা দিতে হবে। পৃথিবীতে যত জাতি বা সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে তার বেশির ভাগ জাতি বা সম্প্রদায়

নৈতিকতা বিচ্যুতির কারণে। আমরা জানি পূর্বের আদ্ জাতি ধ্বংসের মূল কারণ ছিল নৈতিক অধঃপতন। তাদের জাতির লোক সমাজের সকল ধরনের নিকৃষ্ট কাজের সাথে জড়িত ছিল। পরবর্তীতে আমরা যদি রোমান সভ্যতার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব তাদের পতনের মূল কারণগুলোর মধ্যে ছিল ভোগবিলাস ও অনৈতিক চরিত্র। পৃথিবীর আরো অসংখ্য জাতির ধ্বংসের কারণ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে নৈতিক অধঃপতনের কারণেই তারা ধ্বংসের অতলগর্ভে তলিয়ে গেছে।

তাই আমাদের জাতিসত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বা আমাদের এই আধুনিক সত্তাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমাদের যুবসমাজের নৈতিকতার দিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। নৈতিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো ধর্মীয় শিক্ষা। আর এই শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীরা বিভিন্ন কথা চলেছেন।

জন মিল্টন বলেছেন, Education is the harmonies development of mind, body and soul. বিশিষ্ট দার্শনিক সক্রেটিস শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'নিজেকে জানার নামই শিক্ষা'। আমেরিকান শিক্ষাবিদ জন ডেউয়ে বলেছেন, 'প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ ও মৌলিক মেজাজ প্রবণতা বিন্যাস করার প্রক্রিয়াই শিক্ষা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবধর্ম নামক গ্রন্থ বলেছেন, 'মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তার পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই হচ্ছে শিক্ষা'। কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল বলেছেন, 'মানুষের খুশির বা রুহের উন্নয়নই আসল শিক্ষা'।

তাই, যুবসমাজকে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে সেই শিক্ষার সাথে ধর্মীয় বা নৈতিক শিক্ষাও প্রদান করতে হবে। আর নৈতিকতার উন্নয়ন হলে যুবসমাজ দেশগঠনে স্মরণীয় ভূমিকা রাখতে পারে। আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের কল্যাণ সাধনই নৈতিকতার লক্ষ্য।

নৈতিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Collins English Dictionary-তে বলা হয়েছে যে, Morality is concerned with on regating to human behaviors, esp. the distinction between good and bad and right and wrong behavior. নীতিবিদ ম্যুর বলেছেন, 'শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা'।

আমাদের যুবসমাজের গৌরবদীপ্ত অতীত : আমাদের যুবসমাজের অতীত গৌরবদীপ্ত। জাতির আপদকালীন বিভিন্ন সময়ে তারা যে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছে তা অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় যুবসমাজের আগ্রহী ভূমিকার কথা দেশবাসীর চিরকাল মনে থাকবে। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী সেদিন আমাদের মাতৃভাষাকে এ পৃথিবী থেকে বিদায় করার ষড়যন্ত্রে বিভোর ছিল–বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা সেদিন ঢাকার রাজপথে তাদের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে যুবসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যুবসমাজ গৌরবদীপ্ত দায়িত্ব পালন করেছে। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী যুবমসাজ স্মরণযোগ্য অবদান রেখেছে এবং ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল দিনগুলোতে সংগ্রামী যুবসমাজ ব্যাপক ভূমিকা জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে মনে রাখবে।

যুবসমাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি : ভাষা আন্দোলনের পর থেকে যুবসমাজের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। ১৯৫২ সালের মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ছাত্র-যুবসমাজের যে মহান আত্মত্যাগ, তা হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা থেকেই। আমরা বাঙালি জনগণ, আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য ১৯৫২-তে রক্তদান করেছি। স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য প্রাণদান করেছি। '৫৯-এর গণআন্দোলনে, '৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছি এবং সবশেষে স্বাধীনতার জন্য একাত্তরে প্রাণোৎসর্গ করেছি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ত্রিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে, তিন লক্ষ মা-বোন লাঞ্ছিত-নির্যাতিত হয়েছে দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে। বায়ান্ন সালে সৃষ্ট যুবসমাজই ছিল আমাদের সকল সংগ্রামের প্রেরণা শক্তি। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, যুবসমাজের চেতনারই ফসল।

বর্তমানে যুবসমাজের কর্মকান্ড : বর্তমানে যুবসমাজের অবস্থা খুব ভয়াবহ। বর্তমানে আর্থসামাজিক পরিবেশের কারণে যুবসমাজ আজ সন্ত্রাস, চাঁদা আদায় ও হত্যার মতো অপরাধমূলক কর্মকান্ডে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। তাদের মধ্যে আজ নৈরাজ্য, অবক্ষয়, হতাশা, ব্যর্থতা ও আশা ভঙ্গের আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে। অবশ্য গোটা যুবসমাজ এহেন অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে নয়। যুবসমাজধারী মুষ্টিমেয় লোক এর সাথে জড়িত। বৃহত্তর যুবসমাজের মঙ্গলের কথা ভেবে এ অবক্ষয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সচেতন যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের ভুলে গেলে চলবে না জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদান রাখা তাদের কর্তব্য। এ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই কোটি যুবতি বেকার। অথচ যুবক যুবতিরাই হচ্ছে দেশ ও জাতির প্রাণশক্তি। এরাই হচ্ছে সকল কর্মকান্ডের মূল চালিকাশক্তি ও ভবিষ্যতের কর্ণধার। এ যুবসমাজকে বাদ দিয়ে জাতীয় জীবনে উন্নতি অগ্রগতির কথা ভাবাই যায় না। আজকের বাংলাদেশের বেকার যুবসমাজের চিত্র শুধু উদ্বেগজনক নয়, ভয়ঙ্করও বটে। এ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে সমাজে শুধু যে হতাশা বাড়ছে তা নয়, বরং নানাবিধ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দ্বারাও মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। বিঘ্নিত হচ্ছে শান্তি-শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও নিরাপত্তা, বাড়ছে অস্থিরতা ও সামাজিক অপরাধ।

দেশ গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা : যুবসমাজ দেশের সচেতন নাগরিক। তাই জাতি গঠনে তাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। দেশের প্রতিটি বিষয়ে জানা-বোঝা, অর্জন এবং মতামত প্রদানের মধ্যে তারা জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার হিসেবে গড়ে ওঠে। সততা, আদর্শ, নিষ্ঠা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ যুবরাই জাতির সেরা সম্পদ। জাতির সমৃদ্ধি, সম্মান ও আত্মত্যাগের মধ্যেই জাতীয় অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে পারে। যুব সমাজ হলো তারুণ্যের প্রতীক। যৌবনই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়।

এ সময় যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে ব্রতী হওয়া সম্ভব। এ সময়ে কর্মে উদ্দীপনা থাকে সবচেয়ে বেশি। তাই জীবনের যাবতীয় দায়িত্ব নেওয়ার সময় এখন। আমাদের দেশ অনেক দিক থেকে পিছিয়ে আছে। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতা আমাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। এ করুণ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এবং রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সুবাতাস বয়ে দেওয়ার জন্য যুবসমাজ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখতে পারে। আগামী দিনের জীবনে তাদের ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হবে। জাতীয় নানা সমস্যা ও সম্ভাবনার সাথে একাত্ম হওয়ার মধ্য দিয়েই যুবসমাজ জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের যে ভূমিকা রয়েছে তা হলো–

১. নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা।

২. সন্ত্রাস, হত্যা এবং অরাজকতা থেকে দূরে থাকতে হবে।

৩. ধৈর্যশীল হতে হবে।

৪. শরীরের গঠন ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে।

৫. আত্মসচেতন হতে হবে।

৬. সংকীর্ণতা দূর করে বিরাট ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে।

৭. মা-বাবা মুরুব্বীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

৮. বেকারত্ব দূরীকরণ করে দেশ ও জাতির উন্নয়ন করা।

৯. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ।

১০. আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে শহরমুখী জনস্রোত এবং গ্রামীণ অর্থনীতি ও ভারসাম্য রক্ষা।

১১. জনশক্তি সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন।

১২. দেশপ্রেমে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা এবং স্বেচ্ছামূলক কাজে উৎসাহিত করার মাধ্যমে জাতির উন্নয়ন।

১৩. **কর্মমুখী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করার মাধ্যমে** দেশ ও **জাতির উন্নয়ন** : সাধারণ শিক্ষার দিকে বেশি না ঝুঁকে তাদেরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এতে তারা দ্রুত কাজ পাবে। বেকারত্বের অভিশাপ তাদের বইতে হবে না। এতে যুবসমাজের দ্বারা জাতির উন্নতি হবে।

১৪. **প্রশিক্ষণ দান** : যুবসমাজকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মী তৈরি করতে হবে এবং স্ব-স্ব পেশায় দক্ষতা বাড়ানোর জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে এতে যুবসমাজ উৎসাহিত হবে এবং একটি উন্নত জাতি আমাদের উপহার দিবে।

১৫. **উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে হবে** : তাদেরকে কোনো ক্রমেই অসম্মান বা অশ্রদ্ধা করা চলবে না। তাদের প্রাপ্য মর্যাদা, সম্মান ও শ্রদ্ধা কিংবা ভালোবাসা দিতে হবে।

১৬. উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি মাধ্যমে যুবসমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

১৭. **শিক্ষিতের হার বাড়াতে হবে** : আমাদের দেশের শিক্ষার হার মাত্র ৬৫ ভাগ। শিক্ষার হার বাড়িয়ে যুবসমাজকে শিক্ষিত করে দেশ ও জাতির উন্নয়ন করা যাবে।

১৮. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ বিভাগ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, গ্রামীণ ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে আত্মকর্মসংস্থানের প্রকল্প রয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য প্রত্যেক থানা থেকে কয়েকজনকে নির্বাচন করতে হবে। অতঃপর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদেরকে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যমগুলোতে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রকল্পগুলো বেশি বেশি প্রচার করতে হবে এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। এভাবে যুবসমাজ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হবে এবং জাতির কল্যাণ সাধন হবে। এর মধ্যে যেকোনো একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা না করলেই নয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বেকার যুবক-যুবতিদের একটি আশা ভরসা এবং আত্মকর্মসংস্থানের একটি অন্যতম জায়গা। সাধারণত যুবক-যুবতি বলতে বোঝায় ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী মানুষদের। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় বিপদগামী যুবক-যুবতিদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। যেখানে যুবকদের সঠিক পথ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। ৭০টি কেন্দ্র আছে বাংলাদেশে। ঢাকায় বাড়তি ৪টা, চিটাগাং-এ ১টা এবং বিভাগীয় শহরে আছে। এখানে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আগে যারা বেকার হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াত তারাই আজ এখান থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছে। এতে তারা দেশ ও জাতির উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এখানে মাতৃছায়ার মতো প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রশিক্ষকরা আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সাথে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। তাদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে বেকারদের জীবনের গ্লানি মুছে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জাতি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। জাতি গঠনের উন্নয়নের পিছনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকা অপরিসীম।

'মানুষ বাঁচে আশায় আর দেশ বাঁচে ভালোবাসায়' এ কথা মনেপ্রাণে আমরা যুবসমাজ দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখব।

১৯. **দেশপ্রেম** : যুবসমাজ পারে দেশপ্রেমের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নো ত্যাগ স্বীকার করতে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জীবনবাজি রেখে লড়াই করতেও তারা পিছপা হয় না। তাদের এই দেশপ্রেমসমগ্র উদ্বুদ্ধ করে।

দেশপ্রেমের সব সর্বগ্রাসী দিকটি অ্যাডউইন আর্নল্ডের ভাষায় চমৎকার ফুটে ওঠে : 'জীবনকে ভালোবাসি সত্য, কিন্তু দশের চেয়ে বিশি নয়।'

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরণ দুটি প্রাণিধানযোগ্য–

'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর–তোমাতে
বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।'

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে দ্বিগুণ হারে

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের উচ্চতা যতটুকু বাড়বে বলে ধারণা করা হয়েছিল, বৃদ্ধি হবে তার চেয়ে অনেক বেশি। এত দিন বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছিলেন, ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর সমুদ্রস্তরের উচ্চতা সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পাবে এক মিটারের একটু কম। সর্বশেষ গবেষণাটি বলছে, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়তে পারে তার প্রায় দ্বিগুণ।

'প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস' জার্নালে প্রকাশিত এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বলছে, বিশ্ব কার্বন নির্গমন যেভাবে চলছে, তা কমানো না গেলে আগামী দিনের পৃথিবী এখনকার চেয়ে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি উষ্ণতর হবে। সে ক্ষেত্রে ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রস্তরের উচ্চতা ৬২ সেন্টিমিটার থেকে ২৩৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

২০১৩ সালে প্রকাশিত ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (আইপিসিসি) পঞ্চম সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ সমুদ্রস্তরের উচ্চতা ৫২ থেকে ৯৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ওই হিসাব ছিল অনেক বেশি রক্ষণশীল। গ্রিনল্যান্ড ও অ্যান্টার্কটিকায় বরফ গলার প্রক্রিয়ার অনেক দিকই সে সময় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। গ্রিনল্যান্ড ও অ্যান্টার্কটিকায় বরফ গলনের পরিমাণ বেশি হওয়ার ফলে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি হবে অনেক বেশি।

আশঙ্কার কথা হলো, সমুদ্রস্তরের উচ্চতা এভাবে বাড়লে ১.৭৯ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার পরিমাণ ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যাবে, যার মধ্যে একটা অংশ থাকবে বাংলাদেশের। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার কিছু অংশ ছাড়াও বিশ্বের যেসব অঞ্চল পানির নিচে চলে যাবে, তার অনেক অংশই গুরুত্বপূর্ণ ফসল উৎপাদন অঞ্চল, যেমন–নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চল। লন্ডন, নিউইয়র্ক, সাংহাইয়ের মতো কিছু বড় শহরও ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। গবেষণাটিতে বলা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বেশ কিছু এলাকা মানুষের বসবাসের জন্য অযোগ্য হয়ে পড়বে এবং সেসব অঞ্চলের মানুষকে উদ্বাস্তু হয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে হবে। তবে গবেষকরা এটাও বলছেন যে আগামী কয়েক দশকে কার্বন নির্গমনের হার কমানো গেলে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হতে পারে।

তাহলে আমরা একটু পেছনে ফিরে দেখতে পারি কার্বন নির্গমনে বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টার সার্বিক অগ্রগতি কতটুকু। পোল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর কাতোভিচে গত বছরের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ-২৪। ১৯৬টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন সে সম্মেলনে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবেলায় ২০১৫ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত কপ-২১-এর প্রতিশ্রুতি কতটা পূরণ করা যায় সেটাই ছিল কপ-২৪-এর টান টান উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তার বিষয়। প্যারিস সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি শিল্পযুগের আগের তুলনায় দুই ডিগ্রির মধ্যে এমনকি সম্ভব হলে দেড় ডিগ্রির মধ্যে রাখার বিষয়ে একমত হন। কিন্তু সময় যত গড়াচ্ছে, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি তত ঝুঁকির মুখে পড়ছে। জাতিসংঘ বলছে, এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে ২০৩০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ বর্তমানের তুলনায় ৫৫ শতাংশ কমিয়ে আনতে হবে।

২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে ৯০টি দেশের জলবায়ু বিজ্ঞানীদের দেওয়া এক বিবৃতি বলছে, বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বর্তমানের চেয়ে কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে। কিন্তু বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্য হারে কমানোর কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

পোল্যান্ডের কাতোভিচের সম্মেলনে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশ বিপর্যয়ের হুমকিতে থাকা দেশগুলোকে রক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ করা এবং ধনী দেশগুলোকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন। বিশ্বব্যাংকের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক জন রুম বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, আমরা যদি কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে না আনি এবং জলবায়ু অভিযোজন ব্যবস্থা গড়ে না তুলি, তাহলে ২০৩০ সালের মধ্যে আরো ১০ কোটি মানুষ দরিদ্র হবে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) জানিয়েছে, বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি শিল্পযুগের আগের তুলনায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ধরে রাখতে হলে প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করা দেশগুলোকে তাদের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ আরো তিন গুণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হলে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা বাড়াতে হবে পাঁচ গুণ।

সত্যিকার অর্থে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ক্ষেত্রে বিশ্বের দেশগুলোকে প্রথমবারের মতো একতাবদ্ধ করতে পেরেছিল প্যারিস সম্মেলনের বৈশ্বিক জলবায়ু চুক্তি। তখন গ্রিনহাউস গ্যাস কমিয়ে আনতে ২০০টির মতো দেশ যে ঐকমত্য পোষণ করেছে, তাকে অনেক পর্যবেক্ষকই ঐতিহাসিক অর্জন বলে অভিহিত করেছেন। বিজ্ঞানীরা এখনো মনে করছেন, পৃথিবীতে আসন্ন জলবায়ু পরিবর্তনের বিপজ্জনক প্রভাব প্রতিরোধে প্যারিস চুক্তি অবশ্যই কার্যকর করা প্রয়োজন।

প্যারিস চুক্তিতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি বা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রির মধ্যে রাখা এবং জলবায়ু তহবিল গঠন ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল গাছ, মাটি ও সমুদ্র প্রাকৃতিকভাবে যতটা গ্রিনহাউস গ্যাস শোষণ করতে পারে, ২০৫০ থেকে ২১০০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ সে পর্যায়ে নামিয়ে আনা।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক ৬ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে প্রকাশিত 'এমিশন গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৮' বলছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি বন্ধের জন্য নেওয়া বৈশ্বিক চেষ্টা তেমন কোনো কাজে আসছে না। চার বছর পর্যন্ত স্থিতাবস্থায় থাকার পর কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ আবার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত শিল্প ও জ্বালানি খাতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ স্থিতাবস্থায় ছিল। কিন্তু ২০১৭ সালে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ ১ দশমিক ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে প্যারিস জলবায়ু চুক্তির লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। কিন্তু বর্তমানে বেশি পরিমাণে কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর যে স্তিমিত উদ্যোগ বা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে তাতে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারার সম্ভাবনা বেশ কম।

কপ-২৪ সম্মেলন শুরু হওয়ার আগেই বিশেষজ্ঞরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা বিশ্বকে রক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে। প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যগুলোর পুরোপুরি বাস্তবায়নের চেয়েও বেশি কিছু করার দরকার এখন এবং বিশ্বকে রক্ষায় আরো বেশি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ হুমকিতে থাকা দেশ ও দ্বীপরাষ্ট্রগুলো তাই মনেপ্রাণে চেষ্টা করেছিল কপ-২৪ এ যেন কপ-২১ এর প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর আগে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসে ২০১৮-এর নভেম্বরে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনেও বিশ্বনেতারা ঘোষণা দিয়েছিলেন যে প্যারিস চুক্তি অমান্য করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু বিশ্ববাসীর সামনে আজও জ্বলন্ত প্রশ্ন–আমরা কি সত্যি সে লক্ষ্য পূরণের আশা করতে পারব?

❖ **ধরিত্রী সরকার সবুজ**

[ইংল্যান্ডের গ্রিনিচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন' বিষয়ে মাস্টার্স]

মেধা লালন প্রকল্পের ১৯৮৫ ব্যাচের সদস্য

ভাস্কো দা গামার দেশে আমাদের অর্জন

বাংলাদেশের ছাত্ররা এ বছর নিয়ে ২২ বছর ধরে প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করছেন। এবার প্রতিযোগিতা ভাস্কো দা গামার দেশ পর্তুগালে। তিনি দুর্গম পথ অতিক্রম করে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করলেও তাঁর মাতৃভূমিতে যাওয়া আমাদের জন্য সহজ ছিল না। দূতাবাসই নেই, জানলাম ফরাসি দূতাবাসে ভিসার জন্য আবেদন করা যাবে। বাংলাদেশ থেকে দুটি দল শাহজালাল ও বুয়েট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। এর মধ্যে শোনা গেল, ফরাসি দূতাবাস শাহজালালের দলকে ভিসা দেয়নি। এতে করে আমরাও ভয়ে ভয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা জনাব খাস্তগীরকে বলে রেখেছিলাম। বুয়েটের ভিসা হলো ২৫ মার্চ, অনুষ্ঠান শুরু ৩১ মার্চ।

পর্যাপ্তসংখ্যক টিকিট একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে ছাত্রদের টিকিট কাটা হলো অনেক দাম দিয়ে। অনেক আগে টিকিট কাটতে পারলে কম দামে পাওয়া যেত। যা হোক, তুর্কি এয়ারলাইনসের একটি বিমানে করে ইস্তাম্বুল হয়ে বার্সেলোনায় পৌঁছালাম। এরপর পর্তুগিজ এয়ারলাইনসের বিমানে করে পোর্তো শহরে পৌঁছলাম মধ্যরাতে। বিমানবন্দরে সাধারণত স্বেচ্ছাসেবীরা থাকেন, থাকে ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, তা কিছুই দেখতে না পেয়ে একটি নম্বরে ফোন করে বিমানবন্দরের এক কর্মকর্তাই আয়োজকদের ডেকে নিয়ে এলেন। ঝামেলাহীনভাবেই পৌঁছে গেলাম নির্দিষ্ট হোটেলে।

পর্তুগিজ জলদস্যুদের কথা বইতে পড়েছি, তাঁরা সংঘবদ্ধ আক্রমণ করে আমাদের দেশের মানুষের সর্বস্ব লুট করে নিতেন। এখানে যাঁদের সঙ্গে দেখা হলো, তাঁদের মধ্যে এমন রক্ত প্রবাহিত হয় বলে মনে হলো না। যদিও হোটেল এইচএফ তুয়েলাতে রুম পাওয়ার কথা ৩১ তারিখ বেলা দুইটায়, আমাদের বেলা একটাতেই দিয়ে দেওয়া হলো, সঙ্গে সকালের নাশতার কুপনও। কিছুক্ষণের মধ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রুহুল আমিন সিদ্দিকের টেলিফোন কল পেয়ে আত্মবিশ্বাসে পদযুগল আকাশমুখী। এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের কর্মকাণ্ড আলাদা দৃষ্টিতে দেখছি।

আমাদের জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীর উদ্যোগে ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের এই প্রতিযোগিতার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ বাংলাদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে। আমার দৃষ্টিতে এর থেকে বড় সম্মান আর নেই! তাই আয়োজনের যে দিকগুলোতে নজর দিতে হবে, তা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পরিচালক প্রকৌশলী এনামুল কবিরের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। দলগুলোর প্রথম যখন আসার কথা, তার বেশ আগে থেকেই বিমানবন্দরে অভ্যর্থনার জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। এখানে দেখলাম, খাওয়ার সময় দুপুর ১২টা থেকে বেলা ২টা, একটু পরে এলেই ঢুকতে দিচ্ছে না। আমরা অতিথিদের সঙ্গে এ রকম আচরণ করব না, সময়ের পরও আমরা কিছুটা সুযোগ রেখে দেব, যাতে বিদেশবিভুঁইয়ে আগত আগন্তুকদের কোনো অসুবিধা না হয়। প্রতিযোগিতার জন্য দলগুলো পাঁচ দিন অবস্থান করে। আমরা আগেভাগেই সব প্রস্তুতি নিয়ে রাখব, যাতে অতিথিদের কোনো অসুবিধা না হয়।

গোটা আয়োজন আকফানডেগা নামের জায়গায়, ডৌরো নদীর পাশে। এই নদীতে একসময় নাকি রোমানরা অনেক সোনা রেখেছিল। নদীর ওপর দিয়ে বেশ কয়েকটি দৃষ্টিনন্দন সেতু, অনেক উঁচু দিয়ে, যার একটিতে ট্রাম চলাচল করে। শহরটিতে ছোট পাহাড়ি এলাকা রয়েছে।

রাষ্ট্রদূত ২ তারিখে এলেন, আমাদের অনেক সময় দিলেন, পোর্তো শহর খানিকটা ঘুরিয়েও দেখালেন, পরদিনও এলেন। এ দেশের জ্ঞানের চর্চা নিয়ে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করানো যায়, তার চেষ্টা করছেন তিনি। স্থানীয় বাংলাদেশিদের নিয়েও তাঁর অনেক চিন্তাভাবনা। এগুলো শুনে খুবই ভালো লাগল যে আমাদের দেশের রাষ্ট্রদূত দেশের স্বার্থ কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়, কীভাবে তার বিকাশ ঘটানো যায়, তার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

৩ তারিখে প্রতিযোগিতার রিহার্সাল হলো, আমাদের দল দুটি কম্পিউটার সিস্টেমের সঙ্গে পরিচিত হলো। ৪ তারিখের প্রতিযোগিতা শুরু হলো ৪টা ৫০ মিনিটে। পোল্যান্ডের ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের দল প্রথম একটি সমস্যার সমাধান করে ফেলল। তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষিপ্রগতিতে অবাক হতে হয়। নয়টি করে দ্বিতীয় অবস্থানে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, একইসংখ্যক সমাধান করে তৃতীয় অবস্থানে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়। তারপর রয়েছে ন্যাশনাল তাইওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়। ইরানের শরিফ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি সাতটি সমাধান করে নবম অবস্থানে। কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড–উভয় বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে ১৩তম স্থানে। আইআইটি মাদ্রাজ ও রুরকি বিশ্ববিদ্যালয় ১৪তম অবস্থানে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় চারটি সমস্যার সমাধান করে ১৩৫টি দলের মধ্যে একাদশ স্থান দখল করেছে।

এই প্রতিযোগিতায় আমাদের সবচেয়ে ভালো ফল হলো মুনিরুল ও মুস্তাক ফেরদৌসের দলের আমেরিকার সব নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়কে পেছনে ফেলে একাদশ স্থান পাওয়া। এবার পৃথিবীর ৩ হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ হাজার ছাত্র থেকে বাছাই করে ১৩৫টি দল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেছে। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও রাষ্ট্রদূতের বিশেষ চেষ্টা না থাকলে শাহজালালের দলের অংশগ্রহণই অনিশ্চিত থাকত। অবশ্য এ অনিশ্চয়তার মধ্যে তারা ভালো প্রস্তুতিও নিতে পারেনি।

আমাদের দেশে আজ থেকে প্রায় দুই বছর পর যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপ অনুষ্ঠিত হবে, তার জন্য আমাদের অনেক প্রস্তুতি থাকতে হবে, আমাদের নিজেদের দল যাতে সেখানে ভালো করতে পারে, তার জন্য প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা দরকার। আজকাল বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে যান। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রত্যয়ী সরকারকে অবশ্যই এই খাতে বিনিয়োগ করতে হবে। সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কম্পিউটার বিজ্ঞানের ছাত্ররা আমাদের দেশে আসবেন, আমাদের ছাত্ররা তাঁদের দেখে উদ্বুদ্ধ হবেন, তাঁরাও আমাদের দেশের তথ্যপ্রযুক্তির নানা উদ্যোগ দেখে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি উচ্চ ধারণা নিয়ে দেশে ফিরবেন, এটা আমাদের সবার কামনা।

❖ **মোহাম্মদ কায়কোবাদ**
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষক
ও ফেলো, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস
প্রথম আলো ডটকম ১০ এপ্রিল ২০১৯

বিসিএস প্রস্তুতি

৪০তম বিসিএস
কাটমার্কস ও যেভাবে নেবেন লিখিত প্রস্তুতি

৪০তম বিসিএসের প্রার্থীদের মধ্যে এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো কাটমার্কস। ঠিক কত পেলে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে এই চিন্তায় অনেকের রাতের ঘুম হারাম হওয়ার অবস্থা! এবারের প্রশ্নপত্র দেখে যতটুকু বুঝেছি কাটমার্কস ১০০ এর আশেপাশেই থাকবে। যারা ১০০+ পাবেন বলে আশা করছেন তারা আর কালবিলম্ব না করে রিটেনের জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করুন। কারণ রিটেনের জন্য সর্বসাকুল্যে সময় পাওয়া যায় মাত্র ৫-৬ মাস। তাই রেজাল্টের আগে এই সময়টুকু সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন।

বিসিএসে লিখিত পরীক্ষাই অনেকাংশে ক্যাডার নির্ধারণ করে দেয়। তাই লিখিত পরীক্ষায় ভালো করতে পারলে ক্যাডার হওয়ার দৌড়ে আপনি অন্য প্রার্থীদের চেয়ে অনেকাংশে এগিয়ে যাবেন। এখানে সিলেবাস যেহেতু বিশাল তাই নিয়মমাফিক পরিশ্রমের পাশাপাশি কৌশলীও হওয়া প্রয়োজন।

ইংরেজি

যেকোনো চাকরির পরীক্ষায় অধিকাংশ প্রার্থী ইংরেজি নিয়ে শঙ্কায় থাকে। অথচ ইংরেজিতে ভালো করতে পারলে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। তাই সব শঙ্কা দূরে ঠেলে ইংরেজি পরীক্ষায় ভালো করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করুন।

বিসিএসে ইংরেজি ১ম পত্রে ১০০ মার্কস বরাদ্দ থাকে কমপ্রিহেনসনের জন্য। কমপ্রিহেনসন প্র্যাকটিসের জন্য এইচএসসির টেক্সটবুকটি অনুসরণ করতে পারেন; আর গ্রামার প্রিলিমিনারির জন্য যা পড়েছেন তাই বেশি বেশি চর্চা করলেই হবে। আর যারা গ্রামার চর্চার জন্য ভালো বই খুঁজছেন তারা জাকির স্যারের এ প্যাসেজ টু দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বইটি পড়তে পারেন। সামারি বাসায় বসে প্র্যাকটিস করতে পারেন আর লেটারস টু দ্য এডিটর লেখার জন্য ভালো মানের গাইড থেকে নির্দিষ্ট ফরম্যাট দেখে যান, যেহেতু প্যাসেজ সংক্রান্ত বিষয়ই এখানে লিখতে হয়

তাই স্ট্র্যাকচার ঠিক থাকলে বাকিটুকু আপনি বানিয়েই লিখতে পারবেন।

দ্বিতীয়পত্রে রচনার জন্য ৫০ ও অনুবাদের জন্য ৫০ মোট এই ১০০ নম্বর বরাদ্দ থাকে। রচনা সাধারণত সমসাময়িক বিষয়গুলো থেকে এসে থাকে। তাই সমসাময়িক বিষয়ে যত পারুন তথ্য সংগ্রহ করুন। রচনার জন্য সেলফ এসেসমেন্ট বইটি ফলো করতে পারেন। বইটিতে সুন্দরভাবে গুছিয়ে অনেকগুলো রচনা দেয়া আছে যা আপনার প্রস্তুতিতে কাজে লাগবে। আর হ্যাঁ বাসায় বসে প্রতিদিন ৪০/৪৫ মিনিট ফ্রি হ্যান্ড চর্চা করুন। এটি আপনার লেখার গতি ও কোয়ালিটি দুটোই বাড়িয়ে দিবে। অনুবাদ চর্চার জন্য সাইফুরসের ট্রান্সলেশন এন্ড রাইটিং বইটি ফলো করতে পারেন। আর প্রতিদিন প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার সম্পাদকীয় অংশ থেকে অনুবাদ চর্চার অভ্যাস গড়ে তুলুন। অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদের উপর জোর দিন। প্র্যাকটিস করতে গিয়ে ভুল কিংবা শুদ্ধ হোক থেমে না গিয়ে অভ্যাস চালিয়ে যেতে পারলে পরীক্ষার সময় দেখবেন ঠিকই পেরে যাবেন।

বাংলা

বাংলা ১ম পত্রে লিখিতের জন্য বাংলা ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রিলিমিনারিতেই অনেকাংশে পড়ে ফেলেছেন। বাড়তি যেটুকু পড়া হয়নি তা প্রফেসরস/অ্যাসিউরেন্স গাইড থেকে পড়তে পারেন। দুটো বইয়েই ব্যাকরণ ও সাহিত্য অংশ সুন্দরভাবে দেয়া আছে। ভাবসম্প্রসারণ ও সারমর্ম সারাজীবন পড়ে এসেছেন তাই এ নিয়ে বাড়তি চিন্তার কোনো কারণ নেই। প্রফেসরস/অ্যাসিউরেন্স থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবসম্প্রসারণ ও সারমর্মগুলো পড়ে নিন।

দ্বিতীয়পত্রে আপনাকে সময়ের আগে চলতে হবে কারণ এখানে মার্কস ১০০ হলেও লিখতে হবে প্রথম পত্রের চেয়ে অনেক বেশি।

এখানে গ্রন্থ সমালোচনার জন্য মোহসিনা নাজিলার শীকর বইটি ফলো করতে পারেন।

অনুবাদের প্রস্তুতি ইংরেজিতেই হয়ে যাবে।

প্রফেসরস গাইডে বিভিন্ন ধরনের পত্রের ফরম্যাট দেয়া আছে। ওইগুলো দেখে রাখুন।

আর কাল্পনিক সংলাপ একই গাইড থেকে চর্চা করতে পারেন।

বাংলা রচনার জন্য ৪০ নম্বর বরাদ্দ থাকে। বাংলাদেশ বিষয়াবলির সাথে মিলিয়ে রচনা পড়তে পারেন। যেহেতু সাম্প্রতিক বিষয় থেকে রচনা এসে থাকে তাই এ সংক্রান্ত তথ্যের সাথে সবসময় আপডেট থাকুন।

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে মার্কস থাকে ২০০। এ বিষয়ে লিখতে হয় প্রচুর কিন্তু সময় বরাদ্দ থাকে কম। তাই কম সময়ে দ্রুত লেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। ডাটা, উদ্ধৃতির জন্য আলাদা হ্যান্ডনোট ফলো করতে পারেন। যেখানে সুযোগ পাবেন সেখানেই এগুলো ব্যবহার করবেন। ডাটা উদ্ধৃতি দিতে পারলে মার্কস বেড়ে যাবে। বাংলাদেশ বিষয়াবলীর জন্য নিম্নোক্ত বইগুলো পড়তে পারেন–

● প্রফেসরস ● অ্যাসিউরেন্স ● স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস–রাখী বর্মণ ● উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি ২য় পত্র–মোজাম্মেল হক ● বাংলাদেশের সংবিধান ● অর্থনৈতিক সমীক্ষা (সর্বশেষ)

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীতে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য ৪০ ও বড় প্রশ্নের জন্য ৬০ মার্কস বরাদ্দ থাকে। এ বিষয়ের প্রস্তুতির জন্য অ্যাসিরেন্স সিরিজের গাইড ও আব্দুল হাই এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সংগঠন ও পররাষ্ট্রনীতি বই দুটো পড়তে পারেন। দৈনিক পত্রিকার আন্তর্জাতিক বিষয়ক পাতা ও এ সংক্রান্ত সম্পাদকীয় প্রতিদিন পড়ার অভ্যাস করতে পারলে লিখিত পরীক্ষার জন্য অনেক কাজে দিবে।

গণিত ও মানসিক দক্ষতা

ক্যাডার প্রাপ্তিতে গণিত ও মানসিক দক্ষতার ১০০ নম্বর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গনিতে ভালো করার জন্য প্রফেসরস গাইডের পাশাপাশি ৭ম-নবম শ্রেণির গণিত বই ও সিলেবাসের সাথে মিলিয়ে উচ্চতর গণিত অনুশীলন করতে পারেন। আর মানসিক দক্ষতা প্রিলির জন্য যা পড়েছেন তা রিটেনের জন্যও যথেষ্ট, লিখিতর জন্য এ বিষয়ে আর বাড়তি কিছু পড়ার প্রয়োজন দেখছি না।

দৈনন্দিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বিজ্ঞানে বরাদ্দকৃত সময়ে ১০০ মার্কসের উত্তর করে আসতে পারাটা একটু কঠিন বটে তবে অসম্ভব নয়। বিজ্ঞানের জন্য মানবিক বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির বই, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির মাহবুবুর রহমানের লেখা তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার বই ও ওরাকল সিরিজের বইটি পড়তে পারেন। বিজ্ঞান বিষয়ে বেসিক বৃদ্ধির উপর বেশি জোর দিন। খুব বেশি দরকার না হলে পরীক্ষার খাতায় চিত্র দেয়ার দরকার নেই। নিয়মিত প্রস্তুতি নিতে থাকলে বিজ্ঞানে অবশ্যই ভালো করা সম্ভব।

পরিশেষে বলতে চাই কালবিলম্ব না করে লিখিত পরীক্ষার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নেয়া শুরু করুন। লিখিত পরীক্ষায় ভালো নম্বর অর্জন করতে পারলে চূড়ান্ত রেজাল্টে আপনার সাফল্যের হার অনেকাংশে বেড়ে যাবে। ভুল ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো।

❖ **দিদার নূর**
এএসপি, ৩৭তম বিসিএস, মেধাক্রম-৮
সূত্র : thedailycampus.com

ডেঙ্গু জ্বর

কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার ও চিকিৎসা

আবু হাশেম

সদস্য : ১৫৮/৯৩

কারণ

ডেঙ্গু জ্বর ভাইরাস সংক্রমিত একটি রোগ যা এডিস প্রজাতির (Aedes aegypti ev Aedes albopictus) মশার কামড়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই মশা জিকা, চিকুনগুনিয়া এবং অন্যান্য ভাইরাসও ছড়ায়। ডেঙ্গু ভাইরাসের চার ধরনের সেরোটাইপ আছে। কোনো ব্যক্তি যে ভাইরাস দ্বারা প্রথমে আক্রান্ত হয়, সেই ভাইরাসের বিরুদ্ধে তার দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি হয়। এজন্য কোনো ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় চার বারের মতো ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে। যারা আগেও ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে ডেঙ্গু হলে তা মারাত্মক হওয়ার ঝুঁকি থাকে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এটি বেশি দেখা যায়। ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী মশা কোনো ব্যক্তিকে কামড়ালে, সেই ব্যক্তি ৪ থেকে ৬ দিনের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়। এবার এই আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোনো জীবাণুবিহীন এডিস মশা কামড়ালে, সেই মশাটিও ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এভাবে একজন থেকে অন্য জনে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ে।

সময়কাল

সাধারণত জুলাই থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ থাকে। কারণ এ সময়টিতে এডিস মশার বিস্তার ঘটে। কিন্তু এবার ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ নির্ধারিত সময়ের আগেই দেখা দিয়েছে।

এডিস মশা কখন কামড়ায়

ডেঙ্গু জ্বরের জন্য দায়ী এডিস মশা অন্ধকারে কামড়ায় না। সাধারণত সকালের দিকে এবং সন্ধ্যার কিছু আগে এডিস মশা তৎপর হয়ে উঠে। তবে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে দিনের যে কোনো সময় কামড়াতে পারে।

জ্বরের লক্ষণসমূহ

ডেঙ্গু প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে, ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বর এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর। প্রকারভেদ অনুসারে লক্ষণ ভিন্ন হয়ে থাকে।

ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বর

ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বর হলে শরীরে সাধারণত তীব্র জ্বরের সাথে তীব্র ব্যথা হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় জ্বরের মাত্রা ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে যায়। এই ব্যথা বিশেষ করে শরীরের বিভিন্ন জোড়ায় জোড়ায় যেমন কোমর, পিঠের অস্থিসন্ধি ও মাংসপেশিতে তীব্র হয়ে থাকে। এছাড়া মাথায় ও চোখের পেছনে তীব্র ব্যথা হতে পারে। অনেক সময় ব্যথার মাত্রা এত তীব্র আকার ধারণ করে যে মনে হয় যেন হাড় ভেঙে যাচ্ছে। এজন্য এই জ্বরকে 'হাড় ভাঙ্গা জ্বর'ও বলা হয়। জ্বরের ৪ বা ৫ দিনের সময় সারা শরীরে লালচে দানাযুক্ত অ্যালার্জি বা ঘামাচির মতো দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি রোগীর বমি বমি ভাব, এমনকি বমি হতে পারে। এতে রোগী অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধ করতে পারে। এছাড়া রোগীর খাওয়ার রুচি অনেক কমে যায়। কোনো কোনো রোগীর বেলায় জ্বর দুই বা তিনদিন পর আবার আসে বলে একে 'বাই ফেজিক ফিভার'ও বলা হয়। লক্ষণগুলো রোগীর বয়স অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। ছোট বাচ্চা ও প্রথমবার আক্রান্তদের থেকে বয়স্ক, শিশু ও দ্বিতীয়বার আক্রান্তদের মাঝে রোগের তীব্রতা বেশি হয়।

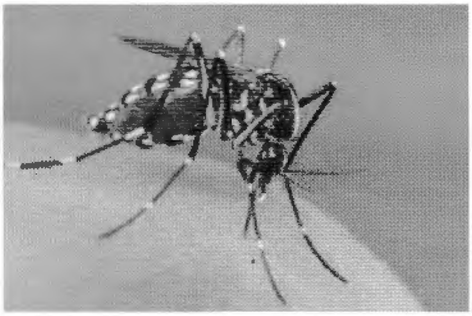

হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর

হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর হলে অবস্থাটা আরও জটিল আকার ধারণ করে। এরকম জ্বরে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে যেমন চামড়ার নিচ, চোখের মধ্যে এবং চোখের বাইরে, নাক, মুখ, দাঁতের মাড়ি কিংবা কফের সাথে রক্ত বমি হতে পারে। এছাড়া কালো বা আলকাতরার মতো পায়খানাসহ পায়খানার সঙ্গে রক্ত বের হতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে অসময়ে ঋতুস্রাব হতে পারে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ অনেকদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। এই রোগ হলে অনেকের বুকে ও পেটে পানি জমার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে লিভার আক্রান্ত হলে রোগীর জন্ডিস দেখা দিতে পারে। আবার কিডনি আক্রান্ত হয়ে রেনাল ফেইলিউরের মতো ঘটনা ঘটতে পারে। ডেঙ্গু জ্বরের ভয়াবহ একটি স্বরূপ হচ্ছে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম যাতে রক্তচাপ হঠাৎ কমে যেতে পারে। অন্যান্য সমস্যার মধ্যে নাড়ির স্পন্দন অত্যন্ত ক্ষীণ ও দ্রুত হওয়া, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, প্রস্রাব কমে যাওয়া, রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়াসহ মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

পরীক্ষা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডেঙ্গু জ্বর হলে খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার দরকার নেই। জ্বরের ৪-৫ দিন পরে সিবিসি এবং প্লাটিলেট করাই যথেষ্ট। এর আগে করলে রিপোর্ট স্বাভাবিক থাকে এবং বিভ্রান্ত হতে পারেন। প্লাটিলেট কাউন্ট ১ লক্ষের কম হলে, ডেঙ্গু ভাইরাসের কথা মাথায় রেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া উচিত। ডেঙ্গু এন্টিবডির পরীক্ষা ৫ বা ৬ দিনের পর করা যেতে পারে, তবে রোগ সনাক্তকরণে সাহায্য করলেও চিকিৎসায় সরাসরি এর কোনো ভূমিকা নেই। প্রয়োজনে ব্লাড সুগার, লিভারের পরীক্ষাসমূহ যেমন এসজিপিটি, এসজিওটি, এলকালাইন ফসফাটেজ ইত্যাদি করা যাবে। রোগের তীব্রতা বেধে চিকিৎসক অন্যান্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে পারেন।

চিকিৎসা

এখনও এর কার্যকরী কোনো টিকা বা ঔষধ আবিষ্কার হয়নি। তাই প্রতিরোধই উত্তম ব্যবস্থা। এই রোগের কোনো সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। তাই রোগের লক্ষণগুলোর উপর চিকিৎসা দেয়া হয়।

- রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে।
- প্রচুর পানি পান করাতে হবে।
- স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে কাপড় ভিজিয়ে শরীর বারবার মুছে দিতে হবে।
- প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খাওয়ানো যাবে।
- ডাক্তারের পরামর্শে ব্যথানাশক ওষুধ দিতে হবে।
- অ্যাসপিরিন বা এ জাতীয় ওষুধ দেয়া যাবে না।

চিকিৎসকের পরামর্শ

উপসর্গ অনুযায়ী সাধারণ চিকিৎসাই যথেষ্ট। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়াই সমীচীন–

- শরীরের যে কোনো অংশ থেকে রক্তপাত হলে।
- প্লাটিলেটের মাত্রা অনেক কমে গেলে।
- শ্বাসকষ্ট হলে বা পেট ফুলে পানি আসলে।
- প্রস্রাবের পরিমাণ কমে গেলে।
- জন্ডিস দেখা দিলে।
- অতিরিক্ত ক্লান্তি বা দুর্বলতা দেখা দিলে।
- প্রচন্ড পেটে ব্যথা বা বমি হলে।
- ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চললে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়।

খাবার

স্বাভাবিক খাবারের পাশপাশি প্রচুর পরিমাণে তরল জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে হবে। যেমন–ডাবের পানি, লেবুর শরবত, ফলের জুস এবং খাবার স্যালাইন ইত্যাদি।

ওষুধ

ডেঙ্গু জ্বর হলে প্যারাসিটামল খাওয়া যাবে। স্বাভাবিক ওজনের একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রতিদিন সর্বোচ্চ চারটি প্যারাসিটামল খেতে পারবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তির যদি লিভার, হার্ট ও কিডনি সংক্রান্ত জটিলতা থাকে, তাহলে প্যারাসিটামল সেবনের আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলে ব্যথার জন্য অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খাওয়া যাবে না। এসময় অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ গ্রহণ করলে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

প্রতিরোধ

এ রোগের কোনো টিকা নেই। তাই প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে হয়। জমে থাকা খোলা পাত্রের পানিতে মশকী ডিম পাড়ে। পোষা প্রাণীর খাবার পাত্র, পানির পাত্র, ফুল গাছের টব, নারকেলের মালা, ফুলদানি, অব্যবহৃত কৌটা, ডাবের খোসা, পরিত্যক্ত টায়ার, খোলা অ্যাকুরিয়াম, ফ্রিজ বা এয়ারকন্ডিশনার ইত্যাদিতে পানি জমে থাকতে পারে। সেগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে।

আক্রান্ত ব্যক্তিকে যাতে মশা কামড়াতে না পারে সেদিকে কড়া নজর দিতে হবে। ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই সব সময় মশারির মধ্যে রাখতে হবে, যাতে রোগীকে কোনো মশা কামড়াতে না পারে।

ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধের মূল মন্ত্রই হলো এডিস মশার বিস্তার রোধ এবং এই মশা যেন কামড়াতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। মনে রাখতে হবে, এডিস মশা অভিজাত এলাকায় বড় বড় দালান কোঠায় বাস করে। স্বচ্ছ পরিষ্কার পানিতে এই মশা ডিম পাড়ে। ময়লাযুক্ত দুর্গন্ধ ড্রেনের পানি এদের পছন্দ নয়। তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশার ডিম পাড়ার উপযোগী স্থানগুলোকে পরিষ্কার রাখতে হবে এবং একই সাথে মশক নিধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

এডিস মশা সাধারণত সকাল ও সন্ধ্যায় কামড়ায়। তবে অন্য সময়ও কামড়াতে পারে। তাই দিনের বেলা শরীর ভালোভাবে কাপড়ে ঢেকে বের হতে হবে, প্রয়োজনে মসকুইটো রিপেলেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। মশক নিধনের জন্য স্প্রে, কয়েল, ব্যাট ব্যবহারের সাথে সাথে মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনে দিনে ও রাতে মশারি ব্যবহার করতে হবে।

ডেঙ্গু জ্বর হয়তোবা নির্মূল করা যাবে না। ডেঙ্গু জ্বরের মশাটি আমাদের দেশে পূর্বেও ছিল, এখনও আছে, মশা প্রজননের এবং বংশবৃদ্ধির পরিবেশও আছে। ডেঙ্গু জ্বর ভবিষ্যতেও থাকতে পারে। তাই সচেতনতা ও প্রতিরোধের মাধ্যমেই এর হাত থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

❖ লেখক পিএইচডি গবেষক, BST Fellow, University of Malaya
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, সাভার, ঢাকা।

রোজা থেকে নৈতিক শিক্ষা

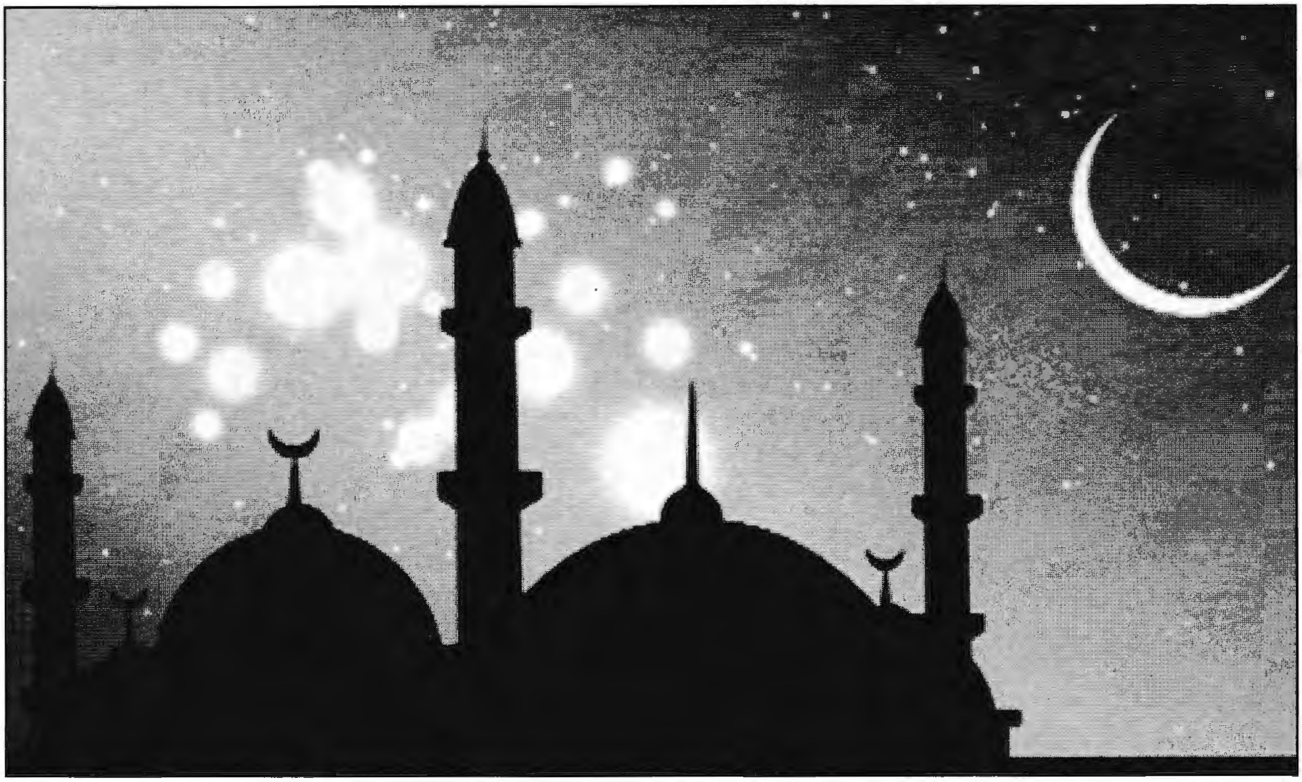

রোজার শিক্ষা মুসলিমদের নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের মধ্যে নৈতিক শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তোলে। দীর্ঘ এক মাস নিয়মিত রোজার অনুশাসন ও রীতি-নীতিগুলো পালন করার ফলে মানুষের মধ্যে ভালো কাজ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। কারণ মুসলমানরা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সঙ্গে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকার ফলে নফসের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, যা তাকে দুষ্কর্ম, কুচিন্তা, কুমনন, কুইচ্ছা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সাওম পালনের মাধ্যমেই মুমিনের আত্মিক উৎকর্ষও সাধিত হয়। ফলে তার পক্ষে পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা, হানাহানি সৃষ্টি করা ও অন্যের ক্ষতি সাধন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (স.) এরশাদ করেছেন, 'সবরের মাসের (রমজানের মাস) রোজা এবং প্রতিমাসের তিন দিনের (আইয়্যামে বীয) রোজা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়' (মুসনাদে আহমদ)। এভাবে রোজা পালনের মাধ্যমে মুমিন মুসলমান তার নফসের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, যা তার চরিত্রের নৈতিক দিক দৃঢ় হতে সহায়তা করে।

ইসলাম ধর্মের অনুসারী সকলের জন্য রোজা ফরজ হওয়ায় এবং ওই ফরজ কাজটি যথাযথভাবে পালনের কঠোর নির্দেশনা থাকায় [তোমাদের যে এ মাসটি পায় সে যেন অবশ্যই রোজা পালন করে (সুরা বাকারাঃ ১৮৫)] প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পানাহার থেকে বিরত থাকায় ধনীরা গরিবের অনাহারে জীবন-যাপন যে কতটা কঠিন, সেই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে। ক্ষুধার তীব্র দংশন যে কতটা ভয়াবহ তা বিত্তবানরা অনুভব করে। ফলে নৈতিকভাবেই গরিবদের সাহায্য করতে ধনীরা উদ্বুদ্ধ হয়। রোজার সব অনুশাসন ও রীতিনীতি রোজাদারকে সকল প্রকার অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত থাকতে সাহায্য করে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, 'রোজা রাখো, যাতে পাশবিক কুপ্রবৃত্তির প্রভাব হতে মুক্ত এবং পরহেজগার হতে পারো।' (সুরা বাকারাঃ ১৮)

মহানবী (স.) বলেছেন, 'রোজা একটি ঢালস্বরূপ। সুতরাং রোজা অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন অশ্লীল কথাবার্তা ও ঝগড়া বিবাদে

লিপ্ত না হয়। কেউ যদি তার সঙ্গে ঝগড়া করতে চায়, অথবা গালি দেয়; তবে সে যেন দু'বার বলে, আমি রোজাদার।' (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)। এভাবে রোজাদার যখন অশ্লীল কথা-কাজ ও ঝগড়া ফ্যাসাদ থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তখন এক মাস ওই কাজ থেকে বিরত থাকায় তার মধ্যে ইতিবাচক অভ্যাস গড়ে ওঠে ও সচেতনতা তৈরি হয়। পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতিটি সদস্য এভাবে ইতিবাচক কাজে ও কথায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে, সে কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

মিথ্যা কথা সকল পাপের জননী। নৈতিক অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। রোজা মিথ্যা কথা বলা থেকে রোজাদারকে বিরত রাখে। হজরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা মোতাবেক আমল ও মূর্খতা ত্যাগ করতে পারলো না, তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোনও প্রয়োজন নেই।' (সহিহ বুখারি)। মিথ্যা কথা বলতে হারাম কথা–মিথ্যা, গিবত, গালি ও অন্যান্য হারাম বাক্যালাপ এবং মিথ্যা কথা মোতাবেক কাজ বলতে মানুষের ওপর জুলুম করা, আমানতের খিয়ানত করা, ধোঁকা দেওয়া, প্রহার করা ও তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা, হারাম গান-বাদ্য ও মিউজিক শ্রবণ ইত্যাদিকে বোঝায়। উল্লিখিত বিষয়গুলো পরিহার আত্মশুদ্ধিমূলক, চরিত্র গঠনকারী ও রোজাদারের জন্য সঠিক পথের দিশারী। তাই যদি কোনও রোজাদার ব্যক্তি বিষয়গুলো পরিহার করতে পারেন এবং এভাবে সমাজের প্রতিটি সদস্য তা অনুসরণ করেন; তবে অচিরেই সমাজ থেকে অনাচার-ব্যভিচার, বিশৃঙ্খলার চির অবসান হবে।

রোজা মানুষের মধ্যে একটি উন্নত ও সম্মানিত জীবনের অনুভূতি সৃষ্টি করে, যা প্রকৃতপক্ষে রোজাদারের অন্তর ও আত্মার খোরাক জোগায় এবং ব্যক্তি জীবনে প্রশান্তির আমেজ বয়ে আনে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আল-কুরআনে বলেন, 'আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকটে প্রার্থনা করে, আমি তার প্রার্থনায় সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক। যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।' (সুরা বাকারাঃ ১৮৬)।

রোজার বিধানটি নতুন না হলেও একথা ঠিক, এই বিধানটি অর্থাৎ এক মাস সাওম পালন ইসলামের প্রথম পর্যায়ে মুসলিমদের জন্য ছিল না। এই বিধানটি প্রবর্তিত হয় মহানবী হজরত মুহাম্মদের (স.) জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা, অর্থাৎ হিজরতের দুই বছর পর হিজরি দ্বিতীয় সনে বা ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে। ওই সময়ে সুরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াত [হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর] অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে রোজা মুসলিমদের জন্য ফরজ করা হয়। যদিও ইসলাম ধর্মের অধিকাংশ ধর্মীয় বিধান মহানবীর (স.) মক্কায় বসবাসের সময়, অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু রোজা সম্পর্কিত ওই বিধান মদিনায় অবতীর্ণ হওয়ার মাহাত্ম্য হিসেবে মনে করা হয়, মক্কায় মুসলিমদের নিজস্ব স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হলেও মহানবীর (স.) ইয়াসরিবে হিজরতের পর, অর্থাৎ মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সমাজকে সুসংগঠিত ও কল্যাণমুখী করতে সদ্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী মুসলিমদের দৈহিক ও আত্মিক আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নৈতিক বলে বলীয়ান একজন মুমিন মুত্তাকি হিসেবে গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়ে। পাশাপাশি জাহেলিয়া যুগের অনেক অনৈতিক কাজ পরিহারও অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। ফলে রোজাই যেহেতু মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রেখে নৈতিক বলে বলীয়ান করে তোলে, সেই কারণে ওই সময়ে মুসলিমদের জন্য এক মাস সাওম পালনের বিধান সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজ ও মদিনা রাষ্ট্রের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে এনেছিল। তাই নৈতিক বলে বলীয়ান মহানবীর (স.) সাহাবিদের সামনে আত্ম-অহংকারে মশাল উড্ডীনকারী মক্কার কুরাইশরা যুদ্ধের ময়দানে বার বার পরাজিত হয়েছে। তাই বদরের ময়দানে মাত্র ৩১৩ সাহাবি নিয়ে মহানবীর (স.) পক্ষে শক্তিশালী কুরাইশ বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল।

রোজা একটি ইবাদত; যা ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভেরও অন্যতম। ফলে রোজা পালনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও সন্তুষ্টি এবং জান্নাত লাভের আশায় নিজের স্বভাবজাত বস্তু ও অভ্যাস যেমন পানাহার ও যৌনাচার ত্যাগ করে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'বান্দা একমাত্র আমার জন্যই তার পানাহার বর্জন করে, রোজা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব।' (সহিহ বুখারি)। তেমনি এর মাধ্যমে মন্দ কাজ পরিহার করার যে অভ্যাস তার মধ্যে গড়ে ওঠে, তা সামগ্রিকভাবে তাকে নৈতিক বলে বলীয়ান করে তোলা। মানুষ লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ-ক্ষোভ ও কামভাবের বশবর্তী হয়ে অনেক সময় যেসব মন্দ কাজে লিপ্ত হতো, রোজা তাকে ওইসব খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে শেখায়।

মুসলিমরা যে দীর্ঘ এক মাস রোজা পালন করেছেন, সেই রোজা যথাযথভাবে পালন করেছেন কিনা, তা বোঝা যাবে রোজার পরবর্তী এগারো মাসে তাদের কার্যক্রম থেকে। যদি সত্যিকার কেউ রোজা পালন করে থাকেন, তাহলে তিনি একজন লোভমুক্ত নিরহংকারী মানুষ হবেন। তাই মুসলিমরা সত্যিকার রোজা পালন করেছিলেন কিনা, তা রমজান পরবর্তী এগারো মাসে তাদের কার্যক্রম থেকে বিষয়টি বোঝা যাবে।

❖ **মো. আবু সালেহ সেকেন্দার**
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
banglatribune.com ৩ জুন ২০১৯

দুর্নীতি প্রতিরোধ : শুধু আইন নয়, বদলাতে হবে মানসিকতা

এক লোকের প্রতিবেশীর সাথে মারাত্মক ঝামেলা। সেই লোকটি একদিন কিভাবে যেন আলাদিনের চেরাগ পেয়ে গেল। চেরাগ ঘষতেই যথারীতি দৈত্য হাজির।

দৈত্য দুটি শর্ত দিয়ে বসলো। প্রথমত, তিনটি মাত্র বর চাওয়া যাবে আর দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে, যে বরই চাওয়া হোক না কেন, প্রতিবেশী পাবে তার দ্বিগুণ। কিছুক্ষণ চিন্তা করে লোকটি দৈত্যেকে বললো, তার একটি চোখ অন্ধ করে দেয়া হোক, একটি হাত ভেঙ্গে দেয়া হোক এবং সব শেষ বরটিতে সে চাইলো, তার একটি পা যেন খোড়া করে দেয়া হয়। বলাই বাহুল্য, তার প্রতিবেশি পেল তার দ্বিগুণ। সন্দেহ নেই, প্রতিবেশিকে শায়েস্তা করতে এই মোক্ষম পথ বেছে নিয়েছিলো লোকটি।

এটি নিছক কৌতুক, তবে আমাদের বাস্তবতাও কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৌতুককে ছাড়িয়ে যায় না?

ঘুস দেয়া এবং নেয়া সমান অপরাধ, এ কথা ছেলে-বুড়ো সবাই জানি। একজন পুলিশ কর্তার এটি আরো বেশি জানার কথা। তার পরও তিনি কেন নিজ থেকে ৪০ লাখ টাকা ঘুস দেয়ার কথা কবুল করলেন?

সাদা চোখে আমরা যেটি দেখতে পাই, ঘুস গ্রহণকারী অর্থাৎ দুদক কর্মকর্তাকে টিট করতেই তার এই পদক্ষেপ। সে জন্য তিনি নিজেকেও ঝুঁকিতে ফেলতে দ্বিধা করেননি। আলোচিত-সমালোচিত পুলিশ কর্তা, সাবেক ডিআইজি মিজানের সাথে দুদক কর্মকর্তা খন্দকার এনামুল বাসিরের ফোনালাপ এখন ভাইরাল। নারী কেলেঙ্কারি, অবৈধ সম্পদ অর্জন, ক্ষমতার অপব্যবহারসহ নানা অভিযোগে জর্জরিত ডিআইজি মিজান গণমাধ্যমের কাছে কেন অবৈধ অর্থের লেনদেনের কথা প্রকাশ করে আরো বিপদ ডেকে আনার রিস্ক নিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে শার্লক হোমস বা ফেলুদাকে ডাকার দরকার নেই। আমরা সবাই বুঝতে পারছি, ঘুসের টাকা দেয়ার পরও কাঙ্ক্ষিত সেবা না পেয়ে তিনি ক্ষিপ্ত।

এ ঘটনার বহুমাত্রিকতা রয়েছে। প্রথমত, ঘুসের লেনদেনের সাথে যাদের নাম এসেছে তারা দুজনই আইনের রক্ষক। ফোনালাপে যে কথোপকথন উঠে এসেছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এ ধরনের লেনদেনের অভিজ্ঞতা তাদের এটাই প্রথম নয়। এই টাকা রাখার জন্য একটি 'ফেইক একাউন্ট' খোলার বিষয়ে বিষদ আলোচনা হয়েছে, যেটি আরেকটি অপরাধ। তা ছাড়া একজন পুলিশ কর্মকর্তা ঘুষ দেওয়ার জন্য ৪০ লাখ টাকা কোথা থেকে পেলেন, সেটিও একটি প্রশ্ন বটে! যদিও ডিআইজি মিজান গণমাধ্যমের কাছে দাবি করেছেন, এই টাকার উৎস দুদককে জানাতে তিনি প্রস্তুত। সর্বোপরি, ঘুষ লেনদেনর মতো অপরাধ আমাদের কাছে কতোটা ডালভাত হয়ে গেছে, তারও একটি প্রমাণ এই ঘটনাটি।

দুর্নীতি বা নীতিবোধের সংজ্ঞা সম্ভবত সময় এবং অবস্থার সাথে পাল্টায়, গণমাধ্যমের কাছে এর সংবাদ মূল্যও পাল্টাচ্ছে। এখন সরকারি প্রকল্পে বালিশ তোলা, দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাকে পুলিশ কর্তার ৪০ লাখ টাকা ঘুষ দেয়ার স্বীকারোক্তি কিংবা আলোচিত একটি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা মাথায় নিয়ে পুলিশ কর্মকর্তার 'আত্মগোপন' এ রকম কিছু ঘটনা ছাড়া ছোটখাট দুর্নীতি আমাদের এখন আর সেভাবে আন্দোলিত করে না। খেলাপী ঋণ ১ লাখ কোটি টাকা ছাড়ালে তবেই সেটি পত্রিকার প্রধান শিরোনাম হয়। এদিকে পাঠকের চাহিদা নেই বলে গণমাধ্যমও 'ছোটখাট' দুর্নীতি-অপরাধের খবর ছেপে পত্রিকার মূল্যবান পাতা নষ্ট করতে রাজি নয়।

আমাদের সমাজে ঘুস-দুর্নীতি মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ হলো, দুর্নীতির সংজ্ঞা আমরা নিজেদের মতো করে পাল্টে নিয়েছি। সমাজের প্রতিটি স্তরেই যার যেটুকু ক্ষমতা আছে, সেটি ব্যবহার করেই অন্যায় পথে অর্থ বা সুবিধা অর্জনকে আমরা এখন রীতিমতো 'অধিকার' বলে মানছি।

সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে সিএনজি অটোরিক্সার মিটারে চলাচলের ঘোষণা দিয়েছিলো। ভাড়া বাড়িয়েও তাদের মিটারে চলাচল নিশ্চিত করা যায়নি। হাইওয়েতে সিএনজি চলাচল বন্ধের পদক্ষেপও নেয়া হয়েছিলো। সেখান থেকেও পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে সরকার। বাস ভাড়ায় নৈরাজ্যতো রয়েছেই, বার বার আস্ফালন-হুঙ্কারেও কাজ হয়নি।

কিছুদিন আগের কথা, রমজান মাসে সরকার কেজি প্রতি সর্বোচ্চ ৫২৫ টাকা গরুর মাংসের দাম বেঁধে দিল, কিন্তু ঢাকার প্রায় সবগুলো মাংসের দোকানেই তা বিক্রি হয়েছে বেশি দামে। আর ঈদের আগে সেটি পৌঁছায় ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকায়। এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি দেয়া সম্ভব–মোট কথা যার হাতে যতোটুকু ক্ষমতা আছে, তার জোরেই আইন বা প্রশাসনকে অবজ্ঞা করে চলছে অবৈধ পথে উপার্জন।

দুর্নীতির আরেকটি প্যানডোরা বাক্স খুলে গেল রমজান মাসে পরিচালিত ভেজাল বিরোধী অভিযানে। অনেক নামিদামি প্রতিষ্ঠানও এই জালে আটকা পড়লো। আমরা শিউরে উঠলাম, খাবারের নামে অসাধু ব্যবসায়ীরা আমাদের কী খাওয়াচ্ছে, সেই চিত্র দেখে। এই বিষয়গুলো যদি সত্যিই আমরা আমলে নিতাম, তাহলে আজকে গুলশান-বানানীর অনেক অভিজাত রেস্তোরাঁয় বসে বসে মাছি মারতে হতো। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা ভিন্ন। ভেজালের দায়ে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো দেদারসে পণ্য বিক্রি করছে, দণ্ড বা জরিমানা কবুল করা হোটেল রেস্তোরাঁগুলো খদ্দের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কিংবা ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি, একই প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি একধিকবার একই অপরাধে দণ্ডিত হয়েছেন, কিন্তু পরিস্থিতি বদলায়নি। সেই প্রতিষ্ঠানগুলো পরিস্থিতির উন্নয়ন না করেই নির্বিঘ্নে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

শুধু আইন প্রয়োগ করে বা শাস্তি দিয়ে দুর্নীতির এই পাহাড়কে টলানো যাবে না। দুর্নীতি দূর করতে হলে এই সংস্কৃতির পরিবর্তন দরকার, প্রয়োজন আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন আর নিজের সুবিধা অনুযায়ী ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা ঠিক না করে ভেজাল-দুর্নীতি-ঘুসসহ সবধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া।

❖ গোলাম কিবরিয়া
dw.com

ফাউন্ডেশন সংবাদ

আমরা শোকাহত

ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বোর্ডের সম্মানিত সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক, রোটারিয়ান হোসনে আরা হক বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে গত ১২ জুন, ২০১৯ ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যাসহ বহু শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, হোসনে আরা হক ছিলেন অবিভক্ত বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্যার আজিজুল হক (যার নামে বগুড়া আজিজুল হক কলেজ এর নামকরণ করা হয়)-এর সুযোগ্য কন্যা এবং বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী ও ফাউন্ডেশনের সাবেক চেয়ারম্যান আজিজুল হক এর সহধর্মিণী। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ছাড়াও তিনি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ইউসেপ বাংলাদেশ, আশা, এ্যাসিসটেন্স ফর ব্লাইন্ড চিল্ড্রেন ইত্যাদি স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ২০০৬ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বোর্ডের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রায় তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে ভূমিকা রেখে গেছেন তা আমরা সবসময় কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবো। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

প্রকল্প সংবাদ

অভিনন্দন!!

উপেন্দ্র নাথ রায় (সদস্য নং ৯৩৪/২০১১) সম্প্রতি 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' এর টেলিভিশন, ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি বিভাগ থেকে সিজিপিএ ৩.৮২ সহ বি.এস.এস (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। উপেন্দ্র নাথ রায় সৈয়দপুর সরকারি কারিগরি মহাবিদ্যালয়, নীলফামারী থেকে ২০১৩ সালে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫.০০ সহ এইচএসসি এবং এর আগে রামগঞ্জ দ্বিমুখি উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারী থেকে ২০১১ সালে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫.০০ সহ এসএসসি পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়। তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন!! আমরা তাঁর জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

ছাত্রজীবনে ভলান্টিয়ারিং কেন জরুরি?

ভলান্টিয়ারিং করতে গিয়ে নেটওয়ার্কিং করার একটা সুযোগ তৈরি হয়। ভলান্টিয়ারদের বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন বয়সের মানুষের সাথে ইন্টারঅ্যাকশনের সুযোগ থাকে। প্রায় সবাই-ই ভলান্টিয়ারদের বেশ গুরুত্ব দেয়। নিজের কাজটা ঠিকমতো গুছিয়ে করতে পারলে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ মানুষের চোখে পড়াটাও সহজ। তাই ভলান্টিয়ারিং তোমাকে কোন চাপ বা এক্সপেক্টেশন ছাড়াই নতুন মানুষজনের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেবে।

গত কিছু বছরে বাংলাদেশে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই সংগঠনগুলো বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানেই ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করার সুযোগ থাকে। ভলান্টিয়ারিং করা যদিও একদমই নিজস্ব পছন্দ, তবুও ছাত্রজীবনে ভলান্টিয়ারিং-এর একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। চলো দেখা যাক, ছাত্রজীবনে ভলান্টিয়ারিং কেন জরুরি...

১. উপযুক্ত সময়

ছাত্রজীবনই ভলান্টিয়ারিং করার উপযুক্ত সময়। লেখাপড়া শেষ করে যখন আমরা ক্যারিয়ার গড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন ইচ্ছে করলেও অনেক কিছুতে সময় দেয়া যায় না। ছাত্রজীবনে দায়িত্ব কিছুটা কম থাকে, অর্থনৈতিক চিন্তাও কম থাকে, নানা ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ থাকে। তাই পরবর্তী জীবনে আফসোস করতে না চাইলে ছাত্রজীবনেই ভলান্টিয়ারিং করা উচিত।

২ সিভিতে অভিজ্ঞতা হিসেবে যোগ হবে

আমরা অনেকেই চাকরিতে আবেদন করতে গিয়ে একটা কমন সমস্যায় পড়ি। সাধারণত বেশিরভাগ চাকরিতেই জব এক্সপেরিয়েন্স চাওয়া হয়। একদম ফ্রেশারদের জন্য চাকরির সুযোগ খুবই কম থাকে। এক্সপেরিয়েন্স না থাকার জন্য আমরা অনেক জায়গায় আবেদন পর্যন্ত করতে পারি না।

এদিকে লেখাপড়া করতে করতে চাকরি করাও তো সম্ভব না! তাহলে উপায় কী?

এই সমস্যার সবচেয়ে ভালো সমাধান হলো, তুমি যে সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়তে চাচ্ছো সে ধরনেরই কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে ভলান্টিয়ারিং করা। যে ধরনের কাজ তোমাকে ভবিষ্যতে চাকরিক্ষেত্রে গিয়ে করতে হবে, তার কাছাকাছি কোনো কাজ ছাত্রজীবনেই ভলান্টিয়ার হিসেবে করতে পারলে, সেটা পরবর্তীতে কাজে লাগবে।

তবে অন্য ক্যারিয়ার রিলেটেড ভলান্টিয়ারিং না করলেও সমস্যা নেই। যে কোনো ধরনের ভলান্টিয়ারিং-ই সিভিতে এক্সপেরিয়েন্স, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি হিসেবে যোগ হবে। সামাজিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানে ভলান্টিয়ারিং এর অভিজ্ঞতা থাকলে তা যে কোনো চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানেই গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয়।

৩. নেটওয়ার্ক তৈরি করবে

লেখাপড়া শেষ করে চাকরিতে ঢোকার পরে কাজের চাপে চাইলেই অনেক কিছু করা যায় না। ভলান্টিয়ারিং করার সময় কাজের চাপ অত বেশি থাকে না, পরিবেশও থাকে বন্ধুসুলভ। অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে বস ও অন্যান্য কলিগদের এক্সপেক্টেশন মেটানোর একটা বিষয় থাকে। এই চাপটা ভলান্টিয়ারদের উপরে কম থাকে।

তাই ভলান্টিয়ারিং করতে গিয়ে নেটওয়ার্কিং করার একটা সুযোগ তৈরি হয়। ভলান্টিয়ারদের বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন বয়সের মানুষের সাথে

ইন্টারঅ্যাকশনের সুযোগ থাকে। প্রায় সবাই-ই ভলান্টিয়ারদের বেশ গুরুত্ব দেয়। নিজের কাজটা ঠিকমতো গুছিয়ে করতে পারলে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ মানুষের চোখে পড়াটাও সহজ। তাই ভলান্টিয়ারিং তোমাকে কোন চাপ বা এক্সপেক্টেশন ছাড়াই নতুন মানুষজনের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেবে।

শুধু তাই নয়, ভলান্টিয়ারিং করতে গিয়ে তুমি সমমনা মানুষদের সাথে একটা কমিনিউটি গড়ে তুলতে পারো। একসাথে ভলান্টিয়ারিং করার সময় খুব ভালো কিছু বন্ধুও খুঁজে পাবে।

৪. ক্যারিয়ার গোল ঠিক করতে সাহায্য করবে

ভলান্টিয়ারিং তোমার ক্যারিয়ার গোল সেট করতে সাহায্য করবে। তুমি কোন ধরনের ক্যারিয়ার গড়তে চাও, সেই ধরনের জবে তোমার কী ধরনের কাজ করতে হতে পারে–তা তুমি ভলান্টিয়ারিং করার মাধ্যমে শিখতে পারবে।

এমনকি তোমার মধ্যে কী কী স্কিল ডেভেলপ করতে হবে, কোন কোন প্রফেশনালিজমে ঘাটতি আছে, তোমার সেক্টরে যারা ক্যারিয়ার গড়েছে তারা কিভাবে শুরু করেছিলো, এখন তারা ক্যারিয়ারকে কোন জায়গায় নিয়ে এসেছে, কোন কাজটা করা উচিত, কোন কাজটা করা উচিত না, কী কী কোর্স করা উচিত, ট্রেনিং নেওয়া উচিত, তোমার ক্যারিয়ারকে কত দিন পরে কোথায় দেখতে চাও–ভলান্টিয়ারিং এই সমস্ত ব্যাপারে রিয়েল লাইফ এক্সপেরিয়েন্স পেতে সাহায্য করবে।

৫. নতুন স্কিল ডেভেলপ করবে

ভলান্টিয়ারিং নতুন নতুন স্কিল ডেভেলপ করতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, এই স্কিল তুমি প্রফেশনালি ডেভেলপ করতে পারবে। প্রফেশনাল মানুষজনের সাথে কাজ করার সময় তারা কিভাবে কাজ করছে, কিভাবে নিজের স্কিল ডেভেলপ করছে, কোন স্কিলগুলোকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে, কোন ঘাটতি কিভাবে কাটিয়ে উঠছে, প্রফেশনাল ম্যানার-অ্যাটিকেট কিভাবে মেইনটেন করছে–সবকিছু নিজের চোখে দেখতে পারবে। সেই সাথে তা নিজের জীবনেও কাজে লাগাতে পারবে।

কোন ধরনের ক্যারিয়ারে, কোন প্রতিষ্ঠানে তোমার পছন্দের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য কী ধরনের স্কিল প্রয়োজন, তা তোমার মধ্যে না থাকলে সেটা তৈরি করার জন্য ছাত্রজীবনই উপযুক্ত সময়।

শুধু ক্যারিয়ার গড়তে বা চাকরি করতেই নয়–ভলান্টিয়ারিং ব্যক্তিগত জীবনেও বিভিন্ন ধরনের স্কিল ডেভেলপ করে। ভলান্টিয়ারিং করতে গিয়ে টাইম ম্যানেজমেন্ট শেখা যায়। অনেক ধরনের পরিস্থিতি হ্যান্ডেল করারও অভিজ্ঞতা হয়।

৬. আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে

অনেকেই জব রিকোয়েরমেন্ট দেখে চাকরিতে আবেদন করার সময় আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভোগে। কাজটা করতে পারব কি পারব না–ভলান্টিয়ারিং-এর এক্সপেরিয়েন্স থাকলে এই ধরনের ভয় কখনোই তোমার মধ্যে কাজ করবে না।

ভলান্টিয়ারিং-এর একটা অন্যতম সুবিধা হলো, বার্ডস আই ভিউ থেকে সমস্ত কিছু একবারে দেখা যায়। চাকরি করার সময় তুমি যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করবে, তার বাইরে অন্য সবকিছু সম্পর্কে জানা বা বোঝাটা কঠিন। কিন্তু ভলান্টিয়ারিং করতে গেলে তুমি সব ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কেই কিছু না কিছু ধারণা নিতে পারবে।

শুধু তাই নয়, ভলান্টিয়ারিং ব্যক্তিগত জীবনেও তোমাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। ঠিক সময়ে কাজ শেষ করা, বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করা, বিভিন্ন মানুষকে হ্যান্ডেল করা, ইভেন্ট পরিচালনা করতে করতে তোমার সামনে এক নতুন পৃথিবী খুলে যাবে। জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক ডিসিশান নিতে সাহায্য করবে।

নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে শেখা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, নতুনভাবে পৃথিবীকে আবিষ্কার করতে শেখাটাও ভলান্টিয়ারিং-এর অবদান।

৭. প্যাশন ফুলফিল করবে

আমাদের অনেকেরই একাডেমিক লেখাপড়ার সাথে প্যাশনের তেমন মিল থাকে না। কেউ হয়তো পশুপাখি পছন্দ করে কিন্তু লেখাপড়া করছে মার্কেটিং-এ, আবার কারো হয়তো সাহিত্যে খুব আগ্রহ, কিন্তু পড়তে হয়েছে গণিতে।

ভলান্টিয়ারিং তোমার প্যাশনকে ফুলফিল করবে। ভলান্টিয়ারিং করতে গিযে তুমি একাডেমিক লেখাপড়ার সাথে প্যাশনকে সমন্বয় করতে পারবে। যত ধরনের সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে চাও, যে সব ক্ষেত্রে পৃথিবীকে বদলাতে চাও–সবকিছুরই প্রথম পদক্ষেপ নিতে পারো ভলান্টিয়ারিং করতে গিয়ে।

কোন সেক্টরে ভলান্টিয়ারিং করতে চাও–তা বেছে নেওয়া একদমই তোমার হাতে। ছোটবেলার যদি কোনো স্বপ্ন থাকে, যা সুযোগের অভাবে পূরণ করতে পারোনি–ভলান্টিয়ারিং তোমার সেই অভাব পূরণ করে দিবে।

৮. সোশ্যাল ও রিলেশনশিপ স্কিল বাড়িয়ে তুলবে

ভলান্টিয়ারিং মানুষের মধ্যে সোশ্যাল ও রিলেশনশিপ স্কিল বাড়িয়ে তোলে। ইন্ট্রোভার্টদের মধ্যে অনেকেই সামাজিক সম্পর্কগুলো মেইন্টেন করতে পারে না। অনেক মানুষের মধ্যে গিয়েও মানিয়ে নিতে পারে না। খুব বেশি মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে কষ্ট হয়। যা জীবনের সব ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করে।

বেশিরভাগ চাকরি ক্ষেত্রে এখন কমিউনিকেশন স্কিলের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর যদি এমন হয় যে, চাকরি ক্ষেত্রে গিয়ে কাস্টমারকে হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে তাহলে তো আর কথাই নেই।

তাই চাইলেও এখন পার্সোনালিটির দোহাই দিয়ে সোশ্যাল ও রিলেশনশিপ স্কিলকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সোশ্যাল ও রিলেশনশিপ স্কিল বাড়িয়ে তোলে।

ভলান্টিয়ারিং কমিউনিকেশন স্কিল বাড়ানোর সাথে সাথে সামাজিক সম্পর্কগুলো কিভাবে মেনে চলতে হয়, সব মানুষের সাথে কিভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় এবং সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হয় এই ব্যাপারগুলোর শিক্ষা দেয়।

তাই যাদের সোশ্যাল ও রিলেশনশিপ স্কিল ভালো না তারা ভলান্টিয়ারিং করার মাধ্যমেই এই স্কিলগুলো ডেভলপ করতে পারো। এই স্কিলগুলো ডেভলপ করার জন্য পরবর্তীতে সময় পাওয়া যাবে না। চাকরি ক্ষেত্রে গিয়ে কোনো ছাড়ও পাওয়া যাবে না। তাই ছাত্রজীবনই এই স্কিলগুলো বাড়িয়ে নেওয়ার উপযুক্ত সময়।

৯. প্যাশন ও পজিটিভিটিই একমাত্র রিকোয়ারমেন্ট

লেখাপড়া হোক বা চাকরি–জীবনের সব ক্ষেত্রেই চান্স পাওয়ার জন্য অনেক ধরনের রিকোয়ারমেন্ট লাগে। কিন্তু ভলান্টিয়ারিং-এ প্যাশন ও পজিটিভিটিই একমাত্র রিকোয়ারমেন্ট।

তুমি যদি একজন পজেটিভ মানুষ হয়ে থাকো, তোমার ভলান্টিয়ারিং করার ক্ষেত্রটি যদি তোমার এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট এবং প্যাশনের জায়গা হয়ে থাকে তাহলে এটিই ভলান্টিয়ার হিসেবে তোমার একমাত্র যোগ্যতা। ভলান্টিয়ারিং করতে চাইলে আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। না কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা না কোনো এক্সপেরিয়েন্স!

১০. কমফোর্ট জোন ভাঙতে সাহায্য করবে

অনেকেই নিজের পছন্দের বাইরে কোনো কাজ করতে চায় না। একসময় একটি কমফোর্ট জোন তৈরি করে তার মধ্যে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে যখন নতুন ধরনের কোনো পরিস্থিতি আসে সেটাকে হ্যান্ডেল করতে পারে না। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

ভলান্টিয়ারিং আমাদের কমফোর্ট জোন ভাঙতে সাহায্য করে। ভলান্টিয়ারিং করতে গিয়ে আমাদের অনেক ধরনের নতুন নতুন কাজ করতে হয়, যেটা আমরা আগে কখনো করিনি। অথচ বাস্তব জীবনে সাফল্যের জন্য এই কাজগুলো অনেক সময় করাটা আবশ্যক হতে পারে, তখন ভলান্টিয়ারিং এর পূর্ব অভিজ্ঞতাটা বেশ কাজে লাগবে।

কমফোর্ট জোন ভেঙে কাজ করার অভ্যাস আমাদের পরবর্তী জীবনে খুব কাজে লাগে। কারণ সব সময় আমরা পছন্দসই কাজ বা পছন্দনীয় সিচুয়েশন পাই না। কমফোর্ট জোন ভাঙার জন্য যে সময় দরকার তাও আমরা পরবর্তী জীবনে পাব না।

ছাত্রজীবনই কমফোর্ট জোন ভেঙে কাজ করতে শেখার উপযুক্ত সময়। ভলান্টিয়ারিং এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১১. সচেতনতা বাড়ায়

ভলান্টিয়ারিং করতে গিয়ে আমাদেরকে অনেক সময় প্রচুর মানুষের মাঝে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করতে হয়। যা অনেক সময় নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও কাজে লাগে। শুধু তাই নয় এই সচেতনতা আমরা আমাদের পরিবারেও ছড়িয়ে দিতে পারি। তাই ভলান্টিয়ারিং শুধুমাত্র সামাজিক গোষ্ঠী নয়, ব্যক্তিগত সচেতনতা বাড়াতেও সাহায্য করে।

১২. ডিপ্রেসন কাটাতে সাহায্য করে

ছাত্রজীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডিপ্রেসড হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ভলান্টিয়ারিং করতে গিয়ে ব্যস্ততা, বিভিন্ন ধরনের কাজ, বিভিন্ন মানুষের সাথে মেশার কারণে ডিপ্রেসড হওয়ার সুযোগই পাওয়া যায় না। কারো যদি ডিপ্রেশন থাকেও তা কাটিয়ে ওঠা যায়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভলান্টিয়ারিং-এর মূল উদ্দেশ্যই থাকে শুধুমাত্র মানবসেবা। যা আমাদের স্যাটিসফাইড জীবনযাপনের সুযোগ করে দেয়।

> যাদের সোশ্যাল ও রিলেশনশিপ স্কিল ভালো না তারা ভলান্টিয়ারিং করার মাধ্যমেই এই স্কিলগুলো ডেভলপ করতে পারো। এই স্কিলগুলো ডেভলপ করার জন্য পরবর্তীতে সময় পাওয়া যাবে না। চাকরি ক্ষেত্রে গিয়ে কোনো ছাড়ও পাওয়া যাবে না। তাই ছাত্রজীবনই এই স্কিলগুলো বাড়িয়ে নেওয়ার উপযুক্ত সময়।

❖ 10minuteschool.com
২৮ এপ্রিল ২০১৯

প্রকল্প সংবাদ

সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন যারা

মেধা লালন প্রকল্প'র প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, এবং অনেকে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেছেন। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে যারা সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেছেন তাঁদের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :

০১. আবুল হাসান মুহম্মদ বাশার (০১/১৯৮৫)
০২. মো. শাহ এমরান (০২/১৯৮৫)
০৩. মো. আবু ছায়েদ (০৩/১৯৮৫)
০৪. মো. আবুল ইসলাম (০৪/১৯৮৫)
০৫. মো. কালাম হোসেন চৌধুরী (০৬/১৯৮৫)
০৬. এ. কে. এম. মেজবাহ উদ্দিন (০৮/১৯৮৫)
০৭. জি. এম. আজিজুর রহমান (০৯/১৯৮৫)
০৮. শাকিল ওয়াহেদ (১০/১৯৮৫)
০৯. সারওয়াত চৌধুরী (১৫/১৯৮৫)
১০. মো. আব্দুল খালেক (১৭/১৯৮৫)
১১. ধরিত্রী কুমার সরকার (১৮/১৯৮৫)
১২. সালেহ মো. মাসুদ (১৯/১৯৮৫)
১৩. শেখ মু. রেফাত আলী (২১/১৯৮৫)
১৪. মো. আব্দুল হালিম (২৩/১৯৮৬)
১৫. এফ. এম. ইসহাক আলী (২৬/১৯৮৬)
১৬. ইমতিয়াজ আহমেদ মজুমদার (৩২/১৯৮৬)
১৭. মো. কামরুল আহসান (৩৩/১৯৮৬)
১৮. মো. আব্দুর রাজ্জাক (৪৭/১৯৮৭)
১৯. মো. আব্দুল লতিফ (৫৭/১৯৮৭)
২০. তাপস কুমার কয়াল (৩৫/১৯৯৬)
২১. শামসুন্নাহার (৩৬/১৯৮৬)
২২. অহেদা হাশমত (৩৮/১৯৮৬)
২৩. শিরীন বানু (৩৯/১৯৮৬)
২৪. আয়েশা খাতুন (৪০/১৯৮৬)
২৫. মো. আব্দুল আজিজ (৪৩/১৯৮৬)
২৬. এস. এম. আব্দুল করিম (৪৯/১৯৮৭)
২৭. মো. আব্দুল হামিদ (৫০/১৯৮৭)
২৮. মো. জাহাঙ্গীর আলম (৫১/১৯৮৭)
২৯. মো. আমিনুল ইসলাম (৫২/১৯৮৭)
৩০. আহমেদ মেহেদী ইমাম (৫৩/১৯৮৭)
৩১. মো. তাজুল ইসলাম (৫৬/১৯৮৭)
৩২. আজিজুন্নেসা (৫৯/১৯৮৭)
৩৩. মাহবুবা সুলতানা (৬১/১৯৮৭)
৩৪. সৈয়দা জারকা জহির (৬৩/১৯৮৭)
৩৫. আফরিন সুলতানা (৬৪/১৯৮৭)
৩৬. আফরোজা আক্তার (৬৫/১৯৮৮)
৩৭. শামীম আরা বেগম (৬৭/১৯৮৮)
৩৮. মো. হেদায়েত উল্লাহ (৬৮/১৯৮৮)
৩৯. মো. মনিরুল ইসলাম (৭১/১৯৮৮)
৪০. দিলরুবা খানম (৭৫/১৯৮৮)
৪১. মো. ইকবাল আহমেদ মজুমদার (৭৬/১৯৮৮)
৪২. অসিত মজুমদার (৭৭/১৯৮৮)
৪৩. মো. মাহবুবুর রহমান (৭৯/১৯৮৮)
৪৪. দেওয়ান মাউদুদুর রহমান (৮০/১৯৮৮)
৪৫. মুহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান (৮২/১৯৮৮)
৪৬. মোছা. দিলরুবা শেলী ৮৩/১৯৮৮
৪৭. শায়লা ওয়াদুদ (৮৬/১৯৮৮)
৪৮. ফারুক আহমেদ (৮৭/১৯৮৯)
৪৯. মো. শাহাদৎ হোসেন (৯১/১৯৮৯)
৫০. শহীদুল ইসলাম (৯৫/১৯৮৯)
৫১. মো. কামরুজ্জামান (৯৬/১৯৮৯)
৫২. নুরুন্নাহার মিনা (৯৮/১৯৮৯)
৫৩. তপন কুমার পাল (১০১/১৯৮৯)
৫৪. মো. আতাউর রহমান (১০৩/১৯৮৯)
৫৫. মো. তৌহিদ-উর-রহমান (১০৬/১৯৮৯)
৫৬. এ.বি.এম. খালেকুজ্জামান (১১৯/১৯৯০)

৫৭. আমেনা বেগম মিমি (১২১/১৯৯০)
৫৮. আজমিয়ারা পারভীন (১২৩/১৯৯০)
৫৯. মোহাম্মদ একরাম উল্লাহ (১৩০/১৯৯০)
৬০. গুলনাহার বেগম (১৩৫/১৯৯১)
৬১. মো. বশিরুজ্জামান মিয়া (১৪৬/১৯৯১)
৬২. প্রতিমা রানী কর্মকার (১৪১/১৯৯১)
৬৩. মো. জালাল আকবরী খান (১৪৩/৯১)
৬৪. মোসা. মেহেরুন্নেছা (১৪৫/১৯৯১)
৬৫. মো. সাইদুর রহমান (১৫১/১৯৯১)
৬৬. মোহাম্মদ আলী (১৫৪/১৯৯৩)
৬৭. প্রানেশ কান্তি বিশ্বাস (১৫৭/১৯৯৩)
৬৮. আবু হাশেম (১৫৮/১৯৯৩)
৬৯. মো. শফিকুল ইসলাম (১৬৩/১৯৯৩)
৭০. মো. লিহাজ উদ্দিন (১৬৫/১৯৯৩)
৭১. সোহেল পারভেজ (১৬৯/১৯৯৩)
৭২. মো. আব্দুল ওয়াদুদ (১৭৩/১৯৯৩)
৭৩. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (১৭৫/১৯৯৪)
৭৪. মো. খোরশেদ আলম (১৭৭/১৯৯৪)
৭৫. মো. মনসুর আলী (১৭৯/১৯৯৪)
৭৬. মিন্টু বৈরাগী (১৮২/১৯৯৪)
৭৭. তুষার কান্তি দাস (১৮৪/১৯৯৪)
৭৮. জবা রানী দেবী (১৮৫/১৯৯৪)
৭৯. লাকি ফারহানা (১৮৬/১৯৯৪)
৮০. মো. সাফায়েত উল্লাহ (১৯৬/১৯৯৪)
৮১. অমর কুমার বর (২০২/১৯৯৫)
৮২. রাশেদ হাসান (২০৫/১৯৯৫)
৮৩. শামসুন্নাহার সালমা (২১৬/১৯৯৫)
৮৪. অসীম কুমার সরকার (২১৭/১৯৯৫)
৮৫. এ. এম. জামাল হোসেন (২২৬/১৯৯৬)
৮৬. মোহাম্মদ মোজাহারুল ইসলাম (২২৮/১৯৯৬)
৮৭. মো. শরিফুল ইসলাম (২৩০/১৯৯৬)
৮৮. মো. তরিকুল ইসলাম (২৩২/১৯৯৫
৮৯. সানী খান মজলিস (২৩৫/১৯৯৬)
৯০. ইলোরা নাহিদ (২৩৬/১৯৯৬)
৯১. মোছা. সুলতানা রাজিয়া (২৩৯/১৯৯৬)
৯২. মু. জামাল উদ্দীন (২৪০/১৯৯৬)
৯৩. নুসরাত জাহান (২৪১/১৯৯৬)
৯৪. ফুয়াদ আশরাফুল আবেদীন (২৪৪/১৯৯৭)
৯৫. দিলরুবা আক্তার (২৪৫/১৯৯৭)
৯৬. মো. এশরামুজ্জামান (২৪৬/১৯৯৭)
৯৭. মনিরা বেগম (২৪৯/১৯৯৭)
৯৮. শ্যামলী রানী দে (২৫২/১৯৯৭)
৯৯. জান্নাতুল ফেরদৌস (২৫৩/১৯৯৭)
১০০. মো. মোজাম্মেল হক (২৫৫/১৯৯৭)
১০১. মো. আসাদুল ইসলাম (২৫৬/১৯৯৭)
১০২. মো. আশিকুল ইসলাম (২৫৭/১৯৯৭)
১০৩. মো. সাইফুল ইসলাম (২৫৮/১৯৯৭)
১০৪. কান্তি ভূষণ মজুমদার (২৬০/১৯৯৭)
১০৫. মো. আলী আজম মিয়া (২৬১/১৯৯৭)
১০৬. মো. মহিউদ্দিন (২৬২/১৯৯৭)
১০৭. মো. আব্দুল মোতালিব (২৬৩/১৯৯৭)
১০৮. সমীরন কান্তি নাথ (২৬৫/১৯৯৭)
১০৯. অলোক কুমার পাল (২৬৬/১৯৯৭)
১১০. মো. নাজমুল হক রাজু (২৬৭/১৯৯৭)
১১১. খায়রুল আলম (১১০/১৯৯০)
১১২. মো. মাহতাবুল ইসলাম (২৭৫/১৯৯৮)
১১৩. মো. সাইফুল ইসলাম (২৭৯/১৯৯৮)
১১৪. এস. এম. মাহফুজুর রহমান (২৮৩/১৯৯৮)
১১৫. মোছা. হীহার আফরোজ শাপলা (২৮৪/১৯৯৮)
১১৬. মোঃ আবু সাঈদ (২৯৬/১৯৯৮)
১১৭. মো. হাসমত আলী (২৮৮/১৯৯৮)
১১৮. নিবেদিতা রায় (৩০০/১৯৯৮)
১১৯. মোহাম্মদ আবু সাঈদ আরফিন খাঁন (৩০৮/১৯৯৯)
১২০. মো. কুতুব উদ্দিন খান (৩০৯/১৯৯৯)
১২১. মো. রহিম মিয়া (৩১৭/১৯৯৯)
১২২. মো. কেরামত আলী (৩১৮/১৯৯৯)
১২৩. মো. এমরান হোসেন (৩১৯/১৯৯৯)
১২৪. সোহেল রানা (৩২১/১৯৯৯)
১২৫. মো. তরিকুল ইসলাম (৩২৩/১৯৯৯)
১২৬. এস. জি. এম. তারিক-বিন-আলী (৩২৭/১৯৯৯)
১২৭. আবু সালেহ মো. কামরুজ্জামান (৩২৮/১৯৯৯)
১২৮. মো. হারুন অর রশিদ (৩২৯/১৯৯৯)
১২৯. মোছা. গায়লা পারভীন (৩৩৪/১৯৯৯)
১৩০. মমতাজ পারভীন (৩৩৯/১৯৯৯)
১৩১. লায়লা আফিফা আজাদ (৩৪০/১৯৯৯)
১৩২. আছিয়া আক্তার (৩৪১/১৯৯৯)
১৩৩. সানজিদা সুলতানা (০৫/২০০৫ এইচএসসি)
১৩৪. কাউকাব আকতার (০৯/২০০৫ এইচএসসি)
১৩৫. ফারজানা ইসলাম খান (১১/২০০৫ এইচএসসি)
১৩৬. মো. আবুল হাসেম (১৫/২০০৫ এইচএসসি)

১৩৭. আতাউর রহমান (১৯/২০০৫ এইচএসসি)
১৩৮. মো. আমিরুল ইসলাম (২৩/২০০৫ এইচএসসি)
১৩৯. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আকন্দ (২৬/২০০৫ এইচএসসি)
১৪০. মো. তরিকুল ইসলাম (৩১/২০০৫ এইচএসসি)
১৪১. নাদিরা মোকাররোমা (৩৪/২০০৬ এইচএসসি)
১৪২. খালেদা ইয়াসমিন (৬৭/২০০৭ এইচএসসি)
১৪৩. ফারজানা ববি (৭৪৬/২০০৮)
১৪৪. মো. সালাহউদ্দিন (৭৭০/২০০৮)
১৪৫. মো. রিদুয়ানুর রহমান (৩৬১/২০০০)
১৪৬. সোহেলুর রহমান (৪৪১/২০০১)
১৪৭. টুম্পা বড়ুয়া (৩৪৩/১৯৯৯)
১৪৮. তাছলিমা আক্তার (৩৪৭/১৯৯৯)
১৪৯. ফারেহা শিরিন চৌধুরী (৩৫১/১৯৯৯)
১৫০. মো. তফাজ্জাল হোসেন (৩৫৬/২০০০)
১৫১. এস. কে. এম. রাকিবুজ্জামান (৩৫৭/২০০০)
১৫২. মো. আবুল খায়ের (৩৬০/২০০০)
১৫৩. মো. রিদুয়ানুর রহমান (৩৬১/২০০০
১৫৪. মো. হাসানুজ্জামান (৩৬৩/২০০০)
১৫৫. মো. আরমান উল্লাহ (৩৬৬/২০০০)
১৫৬. মো. এরশাদুল ইসলাম (৩৭৫/২০০০)
১৫৭. মো. মোকছেদ আলম তন্ময় (৩৭৮/২০০০)
১৫৮. মো. আল ফরহাদ খন্দকার (৩৭৯/২০০০)
১৫৯. মো. জালাল উদ্দীন জায়গীরদার (৩৮৪/২০০০)
১৬০. ফারজানা তানজিন রুমা (২৬৮/১৯৯৭)
১৬১. মোহাম্মাদ (৩৯১/২০০০)
১৬২. খাইরুল আলম (৩৯৪/২০০০)
১৬৩. মোছা. খাদিজা পারভীন (৩৯৮/২০০০)
১৬৪. মোছা. নূর-এ-জান্নাত (৪০৪/২০০০)
১৬৫. হেমা রানী মোহন্ত (৪১৪/২০০০)
১৬৬. কাজী মাহমুদা আক্তার (৪০৬/২০০১)
১৬৭. তানজিয়া আক্তার (৪১৩/২০০০)
১৬৮. মো. আরাফাত হোসেন (৪২৩/২০০১)
১৬৯. মো. মোস্তফা মাহবুব রাসেল (৪২৬/২০০১)
১৭০. সোহেলুর রহমান (৪৪১/২০০১)
১৭১. সুশোভন রায় শুভ্র (৪৫৩/২০০১)
১৭২. মোছা. মীর নুরানী রূপমা (৪৬৫/২০০১)
১৭৩. মো. ফারুক হোসেন (৪৭০/২০০১)
১৭৪. মো. নজরুল ইসলাম (৪৭৪/২০০২)
১৭৫. মো. শাহজাহান কবীর (৪৮১/২০০২)
১৭৬. মো. মিজানুর রহমান (৪৮২/২০০২)
১৭৭. সুকান্ত মন্ডল (৪৮৯/২০০২)
১৭৮. জরহর বালা (৪৯২/২০০২)
১৭৯. রূপন কান্তি নাথ (৪৯৪/২০০২)
১৮০. মোছা. ইসরিন জাহান (৪৯৬/২০০২)
১৮১. শুকা রানী সুত্রধর (৪৯৮/২০০২)
১৮২. শাকিলা-বু-পাশা (৫০৫/২০০২)
১৮৩. মোছা. সেলিনা অক্তার (৫০৮/২০০২)
১৮৪. ডলিয়ারা খাতুন (৫১০/২০০২)
১৮৫. শায়লা শারমীন রূপালী (৫২৫/২০০৩)
১৮৬. শামিমা আক্তার শাপলা (৫২৪/২০০৩)
১৮৭. মোছা. জেসমিন আকতার (৫৩০/২০০৩)
১৮৮. সুস্মিতা কুন্ডু (৫৩৪/২০০৩)
১৮৯. ফাতেমা জেনী (৫৪১/২০০৩)
১৯০. মো. মোস্তফা কামাল (৫৬২/২০০৩)
১৯১. মিঠু চন্দ্র অধিকারী (৫৬৬/২০০৩)
১৯২. দিলীপ কুমার ত্রিপুরা (৫৭২/২০০৩)
১৯৩. মো. আশরাফ সিদ্দিক (৫৭৫/২০০৩)
১৯৪. মো. কামরুল হাসান (৫৭৭/২০০৩)
১৯৫. মো. শামীম কবীর সরকার (৫৭৮/২০০৩)
১৯৬. ফাহমিদা আক্তার (৫৮৯/২০০৪)
১৯৭. ফাতেমা যোহরা (৬০২/২০০৪)
১৯৮. উম্মে হানি (৬০৫/২০০৪)
১৯৯. মোছা. সাইয়্যেদা আখতার (৬০৭/২০০৪)
২০০. মোহাম্মদ নুরুল হাসান (৬১১/২০০৪)
২০১. ইঞ্জি. মো. রওশন আলী (৬১৯/২০০৪)
২০২. মো. সেলিম রেজা (৬২৫/২০০৪)
২০৩. ডা. মু. আসমাউল আলম আল নূর (৬২৭/২০০৪)
২০৪. নূরী জাহান আরবী (৬৫৮/২০০৫ এসএসসি)
২০৫. নার্গিস সুলতানা (৭০৮/২০০৭ এসএসসি)
২০৬. মাকসুদা জাহান আঁখি (০১/২০০৫ এইচএসসি)
২০৭. মোহাম্মদ খুরশেদ আলম (০২/২০০৫ এইচএসসি)
২০৮. এ.কে.এম. কানিজ ফারহানা কণা (৭২৭/২০০৮)

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে
ব্যাচ ২০১৫ (ছাত্র)

ক্রমিক নং	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১.	পলাশ চন্দ্র সরকার ১১৭৫/২০১৫ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	উদ্ভিদবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ সরকারি আকবর আলী কলেজ, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
২.	আব্দুল্লাহ সাদমান জামী ১১৭৬/২০১৫ বিশ্বাসপাড়া, জয়পুরহাট।	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ২য় বর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩.	ইমামুল হোসেন ১১৭৭/২০১৫ মনিরামপুর, যশোর।	এমবিবিএস, ৩য় বর্ষ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ।
৪.	মো. সোহেল রানা ১১৭৮/২০১৫ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	ইতিহাস, ২য় বর্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৫.	মো. সেফাউল ইসলাম ১১৭৯/২০১৫ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	সমাজবিজ্ঞান, ২য় বর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬.	মো. রবিউল ইসলাম ১১৮০/২০১৫ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	অর্থনীতি, ১ম বর্ষ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৭.	মো. এনামুল হক ১১৮১/২০১৫ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	ইংরেজি, ২য় বর্ষ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
৮.	মো. আব্দুর রহিম রবিন ১১৮২/২০১৫ সান্টিবাড়ী, লালমনিরহাট।	ফিশারিজ এন্ড মেরিন বায়োসায়েন্স, ১ম বর্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।
৯.	মো. গোলাম রব্বানী ১১৮৩/২০১৫ খুনিয়াগাছ, লালমনিরহাট।	এগ্রিকালচার, ১ম বর্ষ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
১০.	মো. মনিরুল ইসলাম ১১৮৪/২০১৫ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	ডিপ্লোমা ইঞ্জি., সিভিল টেকনোলজী, ৪র্থ বর্ষ রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রংপুর।
১১.	মোশাররফ হোসাইন ১১৮৫/২০১৫ গৌরিপুর, ময়মনসিংহ।	পুরকৌশল ইঞ্জিনিয়ারিং, ২য় বর্ষ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
১২.	মো. খাইরুল কাজী ১১৮৬/২০১৫ তারাগঞ্জ, রংপুর।	বস্ত্র প্রকৌশল ইঞ্জিনিয়ারিং, ১ম বর্ষ পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পাবনা।
১৩.	জাকির হোসেন ১১৮৭/২০১৫ মনিরামপুর, যশোর।	পদার্থবিজ্ঞান, ২য় বর্ষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
১৪.	মো. আশরাফুল ইসলাম ১১৮৮/২০১৫ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	উদ্ভিদবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ লালমনিরহাট সরকারি কলেজ, লালমনিরহাট।

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে
ব্যাচ ২০১৫ (ছাত্র)

ক্রমিক নং	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১৫.	মো. আসাদুজ্জামান ১১৯০/২০১৫ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	ইংরেজি, ২য় বর্ষ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
১৬.	মো. বায়েজীদ ১১৯২/২০১৫ নাজিরপুর, পিরোজপুর।	ইংরেজি, ২য় বর্ষ সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর।
১৭.	মো. গোলাম মোস্তফা ১১৯৩/২০১৫ গংগাচড়া, রংপুর।	ডিপ্লোমা ইঞ্জি., ইলেকট্রিকাল টেকনোলজী, ৪র্থ বর্ষ রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রংপুর।
১৮.	পলাশ চন্দ্র রায় ১১৯৪/২০১৫ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	এগ্রিকালচার, ২য় বর্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।
১৯.	মো. সাখাওয়াত হোসেন ১১৯৫/২০১৫ মিঠাপুকুর, রংপুর।	ডিপ্লোমা ইঞ্জি., মেকানিকাল টেকনোলজী, ৪র্থ বর্ষ রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রংপুর।
২০.	মো. নাজির আলী ১১৯৬/২০১৫ গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	রসায়ন, ২য় বর্ষ নবাবগঞ্জ সরকরি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
২১.	মো. শাদমান সাকীব ১১৯৭/২০১৫ মিঠাপুকুর, রংপুর।	রসায়ন, ১ম বর্ষ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
২২.	মো. রায়হান সিদ্দিক ১১৯৮/২০১৫ মনাকষা, গংগাচড়া, রংপুর।	ডিপ্লোমা ইঞ্জি., সিভিল টেকনোলজী, ৪র্থ বর্ষ রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রংপুর।
২৩.	মো. তৌফিক হাসান ১১৯৯/২০১৫ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	ডিপ্লোমা ইঞ্জি., কম্পিউটার টেকনোলজী, ৪র্থ বর্ষ কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, কুড়িগ্রাম।
২৪.	মো. মনিরুজ্জামান ১২০০/২০১৫ ডিমলা, নীলফামারী।	হিসাববিজ্ঞান, ১ম বর্ষ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
২৫.	মো. মনিরুজ্জামান খন্দকার ১২০১/২০১৫ কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।	এগ্রিকালচার, ১ম বর্ষ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
২৬.	মো. লিমন মিয়া ১২০২/২০১৫ মিঠাপুকুর, রংপুর।	বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি, ২য় বর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২৭.	মো. হাসিব মাহমুদ ১২০৩/২০১৫ নাজিরপুর, পিরোজপুর।	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ২য় বর্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।
২৮.	মো. নুর মোহাম্মদ ১২০৪/২০১৫ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	প্রাণিবিদ্যা, ১ম বর্ষ লালমনিরহাট সরকারি কলেজ, লালমনিরহাট।

মাথায় কত প্রশ্ন আসে

মানুষ কাকে বলে?

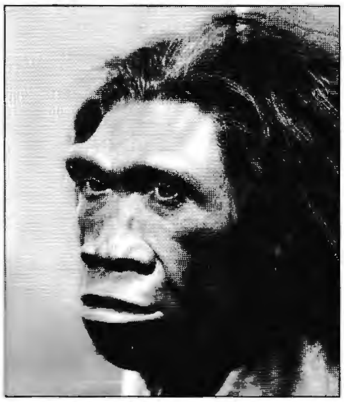

মানুষ কাকে বলে? চট্ করে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। অনেকে বলবে, যার লেজ নেই, সোজা হয়ে দুপায়ে হাঁটে এমন স্তন্যপায়ী প্রাণীকে মানুষ বলা যায়।

এই সংজ্ঞাটি ঠিক হলো না। লেজ নেই এমন অনেক মানুষ্যেতর প্রাণী আছে, যেমন-শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং, গিবন ও গরিলা এবং ঠিক আমাদের মতো সোজা হয়ে হাঁটে না এমন মানুষও পৃথিবীতে ছিল, যেমন নিয়ানডারথাল (Neanderthal)। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির ডুসেলডর্ফ-এর কাছে নিয়াডারথাল উপত্যকায় এদের জীবাশ্ম বা ফসিল প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রায় এক লক্ষ বছর আগে এরা পৃথিবীতে বাস করত। তবে মানুষ বলব কাকে?

বিজ্ঞানীদের কাছে মানুষের অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে। একটি সংজ্ঞা হলো-যে প্রাণী কথার (Speech) সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে মানুষ বলা যায়। বহুজন স্বীকৃত আর একটি সংজ্ঞা হলো-যে প্রাণী তার পরিকল্পনা মতো কোনো নির্দিষ্ট আকারের অস্ত্র যন্ত্র তৈরি করতে পারে, সে অস্ত্র যতই ভোঁতা বা অকেজো হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না, আমরা তাকে মানুষ বলব।

মানুষ বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী জীব। আধুনিক মানুষ (হোমো স্যাপিয়েন্স) হলো হোমিনিনা উপজাতির (অথবা মানব জাতিগোষ্ঠী) একমাত্র বিদ্যমান সদস্য। তাদের বৈশিষ্ট হলো স্থির অবস্থান এবং গতিশক্তি; অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন এবং ভারী সরঞ্জাম ব্যবহারে সক্ষমতা; অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে জটিলতর ভাষার ব্যবহার, আকারে বৃহত্তর ও জটিল মস্তিস্ক এবং খুবই উন্নত ও সংঘবদ্ধ প্রাণী।

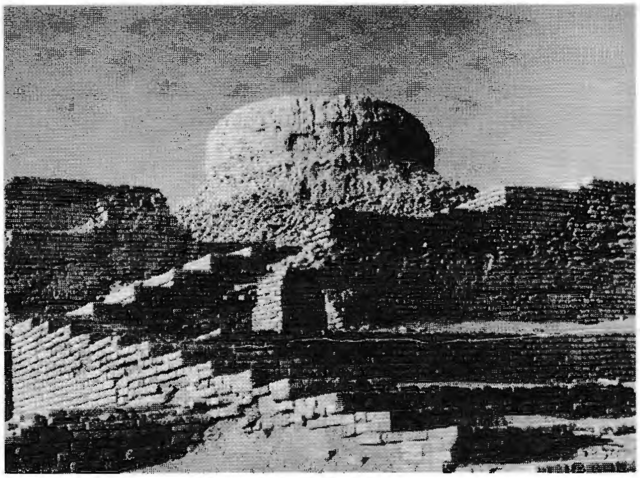

মোহেঞ্জেদারো নগরীটি কেমন করে উধাও হয়ে গিয়েছিল?

আনুমানিক ৩৫০০ বছর আগে মহেঞ্জোদারো (মৃতের টিপি) নগরীটি পৃথিবীর বুক থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। 'মহাভারত' এর বর্ণনা অনুযায়ী এই মর্মান্তিক ঘটনার কারণ একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, যার আগে দেখা গিয়েছিল চোখ ধাঁধানো আলো আর 'ধোঁয়াহীন আগুন'। অতিরিক্ত উত্তাপের দরুণ জলাশয়গুলির পানি ফুটতে শুরু করেছিল এবং 'মাছগুলিকে দেখে মনে হচ্ছিল তারা ঝলসে গেছে।'

১৯২২ সালে সিন্ধু নদীর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। খনন কার্যের ফলাফল আকস্মিক বিপর্যয়ের কাহিনিকে সত্য বলে প্রমাণ করে। খননকৃত এলাকায় পাওয়া গিয়েছিল গলিত পাথর এবং অগ্নিকাণ্ড ও অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরণের বিভিন্ন প্রমাণ। রযমন, এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধ এলাকার মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি ইমারত সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কঙ্কালগুলির অবস্থান এমন ছিল যে সেগুলি দেখে মনে হয়েছে লোকজন তাদের মৃত্যুর মুহূর্তেও নগরীর রাস্তাগুলিতে নিশ্চিন্ত মনে চলাফেরা করছিল। দৃশ্যটা ছিল অনেকটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরবর্তী হিরোশিমা ও নাগাসাকির মতো, সেখানে প্রবল উত্তপ্ত বায়ুর হল্কা ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ এসেছিল উপর থেকে।

মোহেঞ্জেদারোর এই মর্মান্তিক ভাগ্যের কারণ হিসেবে সাধারণত দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পারমাণবিক বিস্ফোরণ। কিন্তু এই অনুমান সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। কারণ সেখানে তেমন কোনো তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। আরেকটি অনুমান হলো অন্য কোনো গ্রহ থেকে আগত একটি মহাশুন্যযান বিস্ফোরিত হয়েছিল। কিন্তু এই অনুমানের সপক্ষেও এ পর্যন্ত কেউ কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির করতে পারেননি।